'শারয়ী রাষ্ট্রনীতি'র ব্যাপারে প্রজাসাধারণকে সচেতনকরণ

অনুবাদঃ
আবু ইবরাহীম আত-তামিমী

MAKTABATUL MANHAL

‘শারয়ী রাষ্ট্রনীতি’র ব্যাপারে প্রজাসাধারণকে সচেতনকরণ

মাকতাবাতুল হিম্মাহ কর্তৃক প্রণীত

অনুবাদঃ
আবু ইবরাহীম আত-তামিমী

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল মানহাল

MAKTABATUL MANHAL

‘শারয়ী রাষ্ট্রনীতি’র ব্যাপারে প্রজাসাধারণকে সচেতনকরণ

توعية الرعية بالسياسة الشرعية

মূলঃ মাকতাবাতুল হিম্মাহ
অনুবাদঃ আবু ইবরাহীম আত-তামিমী
প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুল মানহাল
প্রথম প্রকাশঃ
রবিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরী
অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

الإعداد: مكتبة الهمة
المترجم: أبو إبراهيم التميمي
الناشر بالبنغالية: مكتبة المنهل
ربيع الأول ١٤٤٤ ه
أكتوبر ٢٠٢٢ م

Public awareness about Sharia politics

present by Maktabatul Himmah
translated by Abu Ebrahim At-tamimi
Published by Maktabatul Manhal
Rabi' al-Awal - 1444 Hijri

উৎসর্গ

বিশুদ্ধ ইলমে ওহী অন্বেষণকারীদের প্রতি....

'মাকতাবাতুল মানহাল'

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

মাকতাবাতুল মানহাল কর্তৃক প্রকাশিত বক্ষমান পুস্তিকাসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহের টিকাসহ যেকোন প্রকার সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ব্যতীত যেকোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান দাওয়াহ'র উদ্দেশ্যে বিতরণ ও পরিবেশন করতে পারবে। সাথে সাথে ন্যায্যমূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ও করতে পারবে।

'মাকতাবাতুল মানহাল'

সূচীপত্রঃ

প্রকাশের ভূমিকাঃ

إنّ الحَمد لله و الصّلاة و السّلام على مُحمّد و على آله و أصْحَابِه و بَارك و سلّم

تسْلِيمًا كِثيرًا كثِيرًا، فإِنّ أَصْدَق الحَدِيْث كتاب الله، وَأَحْسَن الهَدْي هَديُ مُحَمّدٍ

ﷺ أمّا بَعْدُ،

যুগ যুগ ধরে মানুষ জাহিলী সমাজ ব্যবস্থার মাঝে বসবাস করছে। ইসলাম এবং মুসলিমদের কর্তৃত্ব হারানোর পর থেকে এক সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে অন্ধকারের ঘোর অমানিশার মাঝে। আলোর দিশারী হবার কথা যাদের তারা আজ জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে আহ্বানকারী হয়ে গেছে - তবে আল্লাহ যাদের উপর রহম করেছেন তারা ব্যতীত। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহ হারিয়েছে পথের দিশা, ভুলে গছে তার রবের পরিচয়, বিচ্যুত হয়েছে নববী মানহাজ থেকে। তাইতো আমরা দেখতে পাই মানুষের মাঝে দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতা চরম সীমায় পৌঁছেছে। উম্মাহ যখন নেতৃত্ব শূন্যতায় ভুগছে, হতাশা আর লাঞ্ছনার অথৈই সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে ঠিক তেমনি এক সময়ে পথের কাণ্ডারি হয়ে দেখা দিলেন শাইখুল মুজাহিদ উসামা বিন লাদেন رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ - তিনি জিহাদের অগ্নি প্রজ্জলিত করেছিলেন যেন উম্মাহ'র গৌরবান্বিত অতীত ফিরিয়ে আনতে পারেন, যেন ফিরিয়ে আনতে পারেন বিজয়ীদের যুগ। তিনি চেয়েছিলেন একটি দাওলাতুল ইসলাম আল-কুবরা তথা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হবে - যার সীমানা হবে এক মহাসাগর থেকে আরেক মহাসাগর।

অতঃপর তার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে আমিরুল ইসতিশহাদিয়্যীন শাইখ আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ 'মাজলীসু-শুরাল-মুজাহিদীন' গঠন করেন। এর পরিপেক্ষিতেই মূলত দাওলাতুল ইসলাম ফিল-ইরাক গঠন করা হয়। দাওলাতুল ইসলাম ফিল-ইরাক সুদৃঢ় পদক্ষেপ ও পরিপূর্ণ শারয়ী

মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে এগিয়ে চলেছে এবং বহুল প্রতিক্ষিত খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, রাসুলে আরাবী ﷺ এর ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে। কিতাবাদিতে আমরা যে শারয়ী আহকামের বর্ণনা পড়েছি আজ তা বাস্তবে অবলোকন করছি দীর্ঘকাল তা অনুপস্থিত থাকার পর - আলহামদুলিল্লাহ্।

নির্ভেজাল তাওহীদের আলো এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার দরুন আজ আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। মুসলিমদের মাঝে অজ্ঞতা জেঁকে বসেছে গভীরভাবে। এ সুযোগে কাফিররা আমাদেরকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী RAND উদ্ভাবিত ইসলাম শেখানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। চেষ্টা করছে আমাদেরকে RAND মুসলিম বানাতে। তারা চায় আমরা যেন তাদের পছন্দসই মডারেট ইসলাম পালন কর। আমরা যেন হই মডারেট মুসলিম এটাই তাদের লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾

"আর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের (ধর্মের) অনুসরণ করেন।"[1]

কারণ কাফিররা জানে যে, মুসলিমদের দ্বীন থেকে অন্য দ্বীন তথা ধর্মের দিকে নিয়ে আসা তাদের জন্য ততটা ফলপ্রসূ নয়। তাই তারা ইসলামকে এতটা পরিবর্তন করতে চায় যে, আদতে তা আর ইসলামই থাকে না। আর এর মাধ্যমেই মূলত তারা সবচেয়ে বেশি মুসলিমকে পথ ভ্রষ্টতা এবং রিদ্দাহ'র দিকে নিয়ে যেতে পেরেছে। তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং নির্ভেজাল উৎস থেকে ইলম অর্জন করতে হবে। নির্ভেজাল উৎস কোনটি? চলুন জেনে নেই উত্তম প্রজন্মের সালাফ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক رَحِمَهُ ٱللَّهُ এব্যাপারে কি বলেছেন! তিনি বলেছেন, "মানুষ যখন কোন বিষয়ে ইখতিলাফে জড়িয়ে পরে

[1] সুরা বাকারাহঃ ১২০

তখন আপনারা লক্ষ্য রাখবেন যুদ্ধের ময়দানে সম্মুখ সারিতে অবস্থানরতগণ কোন বিষয়ের উপর রয়েছেন। কেননা আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى বলেন, "আর যারা আমার রাস্তায় জিহাদ করে অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব।"[2] মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন رَحِمَهُ اللهُ বলেছেন, "নিশ্চয়ই এই ইলম হল দ্বীন। তাই আপনারা কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করবেন সেটা লক্ষ্য রাখুন!"

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি ইলমের বিশুদ্ধ উৎস সম্পর্কে। তাই মুসলিমদের মাঝে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে দাওলাতুল ইসলামের ইলমী খেদমত অব্যাহত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় "শারয়ী রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে প্রজাসাধারণকে সচেতনকরণ" নামক কিতাবটি গবেষণা ও শিক্ষা অফিস প্রস্তুত করেছে। বি-ইযনিল্লাহ!

আমরা 'মাকতাবাতুল মানহাল'এর পক্ষ থেকে বইটি অনুবাদ এবং প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। বাণিজ্যিক লেখনির ব্যাপকতার ভিড়ে ইলমে ওহীর প্রচার-প্রসার নিতান্তই কমে আসছে। তাই এখন সময়ের দাবি যে, বিশুদ্ধ ইলমে ওহীর প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে একদল মু'মিন উঠে দাঁড়াবে। আল্লাহর উপর ভরসা করে আমরা এই মহান দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি। এ গুরুদায়িত্বভার কাধে নিয়ে লক্ষপানে আমাদের ছুটে চলা - যেন বাংলার আনাচে-কানাচে নববী মানহাজের সৌরভ ছড়িয়ে পরে। আমি মনে করি, বাংলায় খিলাফাহ'র সৈনিক এবং সাধারণ মুসলিমগণ এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবেন - ইনশা'আল্লাহ। আমরা বইটি অনুবাদ এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মানোন্নয়ন করার চেষ্টা করেছি। আরো প্রয়াস চালিয়েছি সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করতে। আমরা বইটিকে নির্ভুলভাবে প্রকাশের যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছি।

---

[2] সুরা আনকাবুতঃ ৬৯

আল্লাহ যেন আমাদের এই চেষ্টা-প্রচেষ্টা, আমাদের এই ক্ষুদ্র খেদমতটুকু তার রাস্তায় কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করেন। আল্লাহ যেন এই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মাকতাবাতুল মানহাল'কেও ভরপুর কামিয়াবি দান করেন - আমিন! আপনারা আপনাদের কল্যাণকর দু'আয় আমাদেরকে ভুলবেন না।

وآخِر دَعوانا أن الحَمد لله ربِّ العٰلمِين

وصلّي اللهُ تَعَالَى على خَيرِ خَلقِه مُحمّدٍ وآلِه وأصحَابِه أجمَعِين

আবু লাইছ আল-হিন্দী

মাকতাবাতুল মানহাল

রবিউল-আওয়াল - ১৪৪৪ হিজরী

ভূমিকাঃ

الحَمْدُ لله مظهرِ الدِّين ولو بعد حين، والصَّلاة والسَّلام على القوي الأمين وعلي آله وصحبه والتابعين، أمّا بَعْدُ؛

হুযাইফাহ ইবনু ইয়ামান رَضِيَاللَّهُعَنْهُ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন। তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর আসবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ। তাও ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন। তারপর মহান আল্লাহ তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর আসবে যন্ত্রণাদায়ক বংশীয় রাজত্ব। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা তা রাখবেন, অতঃপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নিবেন। এরপর আসবে জুলুমের রাজত্ব এবং তা ততদিন থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন। তারপর আল্লাহ তাও উঠিয়ে নিবেন। এরপর আবার আসবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ।”

মানুষ এই যুগে জুলুমের কর্তৃত্বের শাসনের অধিনে জীবন-যাপন করছে। যে শাসনে লৌহ ও অগ্নি শক্তির মাধ্যমে কর্তৃত্ব করছে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা। ফলে তারা কুফরি আইনসমূহকে বিচারক বানিয়েছে এবং এগুলোকে সৃষ্টির উপর আরোপ করেছে। তবে নাবী ﷺ এর অনুসারীগণ ব্যতীত যারা তার আদেশ বাস্তবায়ন করে ও তার সংবাদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে সরঞ্জামাদির প্রস্তুতি নিয়েছে, জুলুমের শাসনের তাগুতদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে যুদ্ধ করেছে এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে তারা হীনতা মেনে নেয়নি। যতক্ষণ না তারা ফাতহে মুবীন তথা সুস্পষ্ট বিজয় প্রত্যক্ষ করেছে। আর তারা তাদের রক্ত ও ছিন্নভিন্ন দেহের বিনিময়ে খিলাফাহ ফিরিয়ে এনেছে।

আর যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট বিজয়ের প্রত্যাশা করে

তার উজ্জ্বল চাবিকাঠি তো দৃঢ় সঙ্কল্প উটের পায়ের মত

এই খিলাফাহ যেন খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ তথা নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ হয় সেজন্য অপরিহার্য হচ্ছে কুরআনের বিধান ও নববী সুন্নাতের হাদিসের মাধ্যমে শাসন করা এবং ছোট-বড় সকল ক্ষেত্রে শারয়ী সিয়াসাতের মাধ্যমে পরিচালনা করা। এজন্য আমরা এই সংক্ষিপ্ত কিতাবটি রচনার দায়িত্ব নিয়েছি। যেন এই কিতাবটি তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রজাসাধারণ বা নাগরিকের জন্য সাহায্যকারী হয়। আমরা এর নামকরণ করেছি, 'শারয়ী রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে প্রজাসাধারণকে সচেতনকরণ'।

আমরা আল্লাহর নিকট কামনা করি তিনি যেন তা কবুল করেন ও তা ছড়িয়ে দেন এবং তিনি যেন এই কিতাবটিকে কালের পরিক্রমায় উত্তম ব্যক্তিদের জন্য প্রদীপ বানিয়ে দেন - আমিন! আমাদের সর্বশেষ বক্তব্য হল সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

গবেষণা ও শিক্ষা অফিস

১৪৩৬ হিজরী

প্রারম্ভিকাঃ

শারয়ী রাষ্ট্রনীতির পরিচয়

শাব্দিক অর্থে রাষ্ট্রনীতিঃ রাষ্ট্রনীতির অর্থগুলো কোন বিষয় পরিচালনা করা, ব্যবস্থাপনা করা এবং ঐ বিষয়কে যা সংশোধন করে তাতে হস্তক্ষেপ করার আশেপাশে প্রদক্ষিণ করে। 'আল-মু'জামুল ওয়াসিত্ব'এ এসেছেঃ "সে মানুষকে পরিচালনা করেঃ সে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দায়িত্ব নিয়েছে। চতুষ্পদ প্রাণীঃ সে তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ও আদব শিক্ষা দিয়েছে। আর বিষয়াদিঃ সে তা পরিচালনা করেছে এবং সে তা সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েছে - সুতরাং সে পরিচালক।"[3]

পারিভাষিক অর্থে রাষ্ট্রনীতিঃ ফক্বীহগণ রাষ্ট্রনীতিকে ভাগকরণের ক্ষেত্রে দুই প্রকারে বিন্যস্ত করেছেনঃ

অত্যাচারী রাষ্ট্রনীতি - শারীয়াহ একে হারাম সাব্যস্ত করে।

ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনীতি - অত্যাচারী থেকে অধিকার বের করে, বহু অত্যাচার দূর করে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের নিবৃত্ত করে। আর এর মাধ্যমে শারয়ী উদ্দেশ্যসমূহে পৌঁছা যায়।[4]

শারয়ী রাষ্ট্রনীতিঃ ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনীতি যা পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং মানুষের দ্বীনী বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা সংশোধনের জন্য কাজ করে যতক্ষণ না আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হয়, মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয় এবং জীবনের সকল বিষয়ে ইসলামী শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা হয়। শারয়ী রাষ্ট্রনীতি মানুষের দুনিয়াবি বিষয়াদিতে তাদের অবস্থা সংশোধনের জন্য এবং তাদের জীবন পদ্ধতির বিষয়গুলো পরিচালনা করার

---

[3] দেখুন - আল-ক্বমূস ও লিসানুল আরব

[4] দেখুন - তাবসিরাতুল-হুক্কামঃ ২/১১৫ এবং ত্বরুক্কুল-হাকামিয়্যাহঃ ২৯

জন্য কাজ করে। তিনি تَبَارَكَ وَتَعَالَى বলেন,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

"হে দাউদ! আমরা আপনাকে যমিনে খলিফাহ বানিয়েছি, অতএব আপনি লোকদের মধ্যে সুবিচার করুন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, কেননা তা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে আছে।"[5]

ইমাম ইবনে কাসীর رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "এটা আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর পক্ষ থেকে কর্তৃত্বশীলদের প্রতি একটি ওয়াছিয়্যাহ যে, তারা যেন আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى এর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত হক্বের মাধ্যমে মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করে এবং এ থেকে ফিরে না আসে। তাহলে তারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। তিনি تَبَارَكَ وَتَعَالَى ঐ ব্যক্তিকে ভীতিপ্রদর্শন করেছেন যে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় এবং হিসাবের দিনে নিশ্চিত হুমকি ও কঠোর শাস্তির বিষয় ভুলে যায়।"

তিনি তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

[5] সুরা ছ'দঃ ২৬

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ-এর হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফায়সালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[6] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "এই আয়াত কর্তৃত্বশীলদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে; তাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে তারা আমানতের হক্বদারদের নিকট তা পৌঁছে দিবে এবং যখন মানুষের মাঝে শাসন করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে শাসন করবে।"

তিনি বলেন, "কর্তৃত্ব দ্বারা আবশ্যকীয় উদ্দেশ্য হল মানুষের দ্বীন সংশোধন করা। যখন এটা তাদের থেকে ছুটে যাবে তখন তারা সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর দুনিয়াতে তারা যা উপভোগ করে তা তাদের কোন উপকারে আসবে না। আবশ্যকীয় উদ্দেশ্যের আরো একটি হচ্ছে ঐ বিষয় সংশোধন করা যার মাধ্যমে তাদের দুনিয়াবি বিষয়াদিতে দ্বীন প্রতিষ্ঠা হয়।"

যেহেতু এই রাষ্ট্রনীতি এবং এই মহান উদ্দেশ্য শক্তি, ইমারাত, রাষ্ট্র ও কর্তৃত্ব ব্যতীত যথাযোগ্যভাবে পূর্ণতা পাবে না। তাই ইমাম নিয়োগ করা এবং দ্বীন রক্ষা করা ও দ্বীন দ্বারা দুনিয়া পরিচালনা করার জন্য মুসলিম তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। এর গুরুত্ব এবং এর আবশ্যকীয়তার ব্যাপারে অসংখ্য দলিল রয়েছে - যা গোপন নয়। ইনশা'আল্লাহ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এর মধ্য থেকে আংশিক কিছু দলিল উপস্থাপন করব।

[6] সুরা নিসাঃ ৫৮

প্রথম অধ্যায়ঃ

দাওলাতুল ইসলাম

প্রারম্ভিকাঃ

দাওলাতুল ইসলামঃ অনেক অঞ্চলের সমষ্টি; রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিসমূহ বসতীপূর্ণ নির্দিষ্ট কিছু ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব বাস্তবায়ন করার জন্য একত্রিত হয়। এই সকল কর্তৃত্বের উপর একজন শাসক অথবা খলিফাহ অথবা আমিরুল মু'মিনীন থাকে। আর এটাই শারয়ী রাষ্ট্রনীতির ফুক্বাহাগণের নিকট অথবা রাষ্ট্রীয় বিধানমালায় "দাওলাহ" তথা "রাষ্ট্র" পরিভাষা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য। এ ফলশ্রুতিতে বলা সম্ভব হয় যে, দাওলাহ তিনটি রুকুনের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ ভূমি, প্রজাসাধারণ এবং ক্ষমতা।

নিযাম ও প্রদেশের সমষ্টি নিয়ে দাওলাহ গঠিত হয় এইভাবে যে, দাওলাহ'র প্রত্যেক প্রদেশ দাওলাহ'র দায়িত্বসমূহের মধ্য থেকে এক বিশেষ দায়িত্ব সম্পন্ন করে এবং সার্বজনীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য সমেবেতভাবে কাজ করে। আর এটাই মুসলিমদের দ্বীনী ও দুনিয়াবি কল্যাণসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ।

পরিচ্ছেদঃ

দাওলাতুল ইসলামের তাৎপর্য এবং তা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকীয়তা

দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার তাৎপর্যঃ যে মহত্তর লক্ষ্যের নিমিত্তে আল্লাহ তার রাসুলকে প্রেরণ করেছেন তা হল মানুষকে তার রবের দাসত্ব করানো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জ্বীন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই।"[7]

ইবাদাতের বাস্তব অবস্থা হল - মানুষ তার রবের প্রতি অনুগত হওয়াকে নিরঙ্কুশ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল ক্ষমতার প্রতি অনুগত হওয়া ও আত্মসমর্পণ করা থেকে নিজেকে মুক্ত করা। এটাই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"এর বাস্তবতা। এ কালিমা মানুষকে - এর প্রতি তার ঈমান আনয়ন করার মাধ্যমে - লাঞ্ছনা ও দাসত্বের উপায়-উপকরণ থেকে মুক্তি দেয়; আর ঈমান ও কুফরের মাঝে লড়াইয়ের বাস্তবতা হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ আদেশকারী এবং নিষেধকারী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর অধিকারের জন্য লড়াই করাঃ

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾

"আর তিনিই আসমানে এবং যমিনে সত্য ইলাহ। আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞানী।"[8]

---

[7] সুরা যারিয়াতঃ ৫৬

[8] সুরা যুখরুফঃ ৮৪

কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষদের উপর কর্তৃত্বকারী লোকদের নেতৃত্ব ও মানুষদের উপর তাদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া এবং নেতৃত্ব ও ক্ষমতা এককভাবে আল্লাহর জন্য ফিরিয়ে আনা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব বাস্তবায়ন করা এবং নাবীগণের দাওয়াহ বাস্তবায়ন করা সম্পন্ন হবে না।

এজন্য শারীয়াহ এই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে একটি দাওলাহ প্রতিষ্ঠা করার আদেশ করেছে; কেননা এই উদ্দেশ্য জীবনের মধ্যে ব্যক্তিতান্ত্রীক চালচলনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে না। বরং এমন এক কর্তৃত্বের প্রয়োজন যে তাওহীদ রক্ষা করে তা ছড়িয়ে দিবে এবং শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে হুদুদ বাস্তবায়ন করবে।[৭]

যেমন আমিরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবী তালিব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন, "মানুষের জন্য নেতৃত্ব থাকা আবশ্যক - হোক তা ন্যায়পরায়ণ অথবা পাপিষ্ঠ।"

তারা বলল, হে আমিরুল মু'মিনীন! ন্যায়পরায়ণ তো আমরা বুঝলাম কিন্তু। পাপিষ্ঠের অবস্থা কি? তিনি বললেন, "যার মাধ্যমে হুদুদ প্রতিষ্ঠা করা হবে, রাস্তাগুলো নিরাপদ হবে, যার মাধ্যমে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে এবং ফাই বণ্টন করা হবে।"[10]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللَّهُ বলেন, "এটা জানা আবশ্যক যে, দ্বীনের সবচেয়ে আবশ্যকীয় বিষয়ের একটি হল মানুষের বিষয়াদির কর্তৃত্ব করা। পরন্তু এর মাধ্যমেই দ্বীন প্রতিষ্ঠা হয়। কারণ বানী-আদম তাদের একজনের প্রতি অপরজন প্রয়োজনের জন্য একত্রিত হয়। আর এর মাধ্যমেই তাদের কল্যাণ সম্পন্ন হয়।"

তিনি এর কারণ যুক্ত করেছেন, "কেননা আল্লাহ সৎ কাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব করেছেন। আর এটা শক্তি ও

---

[৭] ই'লামুল আনাম বি-মীলাদি দাওলাতিল ইসলাম

[10] আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহ লি-ইবনে তাইমিয়্যাহঃ ৬৩

কর্তৃত্ব ব্যতীত সম্পন্ন হবে না। এমনিভাবে আল্লাহ অন্যান্য যেসকল বিষয় ওয়াজিব করেছেন - যেমন জিহাদ করা, ন্যায়বিচার করা, হজ্জ করা, ঈদ পালন করা ও মাজলুমকে সাহায্য করা এবং হুদুদ প্রতিষ্ঠা করা শক্তি ও ইমারাহ ব্যতীত সম্পন্ন হবে না।”[11]

দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিবঃ

দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে আলোচনা শারয়ী স্বতঃস্ফূর্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু এই বিষয়টি অনেক অপরিচিত হওয়ার কারণে আমাদের প্রমাণভিত্তিক মুজমাল সারসংক্ষেপ কতিপয় নছ ও ইজমা উল্লেখ করা উত্তম হবে।

তিনি তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিস্তাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি যমিনে খলিফাহ সৃষ্টি করছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আর আমরা আপনার হামদসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি

[11] আস-সিয়াসাতুশ শারইয়্যাহঃ ১৬২

বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।”[12]

ইমাম কুরতুবী رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ বলেন, “এই আয়াত হল একজন ইমাম (নেতা) ও খলিফাহ নিয়োগ করার ব্যাপারে একটি মূলনীতি - যার আনুগত্য করা হবে যাতে কালিমাহ এক হয় এবং খলিফাহ’র হুকুমগুলো এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। আর ইমাম ও খলিফাহ নিয়োগ করার বিষয়টি ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মাতের মাঝে এবং ইমামগণের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে বধির থেকে যা বর্ণনা হয় তা ব্যতীত; যেহেতু সে শারীয়াহ’র ব্যাপারে বধির। এমনিভাবে প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে তার কথা দ্বারা কথা বলে এবং তার মত ও পথের অনুসরণ করে।”

তিনি তা’আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের। অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামাত দিবসের উপর ঈমান এনে থাক। আর এটাই পরিণতির দিক দিয়ে কল্যাণকর এবং উত্তম।”[13]

ইমাম ইবনে কাসীর رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ তার তাফসীরে বলেন, “আল্লাহ অধিক

[12] সুরা বাকারাহঃ ৩০

[13] সুরা নিসাঃ ৫৯

ভালো জানেন - দৃশ্যত আয়াতটি ব্যাপকভাবে উলামা ও নেতাগণের মধ্য থেকে সকল ওলীল-আমরদের (কর্তৃত্বশীলদের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।”

আয়াতের দালিলিক দৃষ্টিকোণঃ আল্লাহ কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন। আর আদেশ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে দলিল। আল্লাহ তা’আলা এমন ব্যক্তির আনুগত্য করতে আদেশ করেন নি যার কোন অস্তিত্ব নেই। ফলে উম্মাতের উপর তাদের জন্য ইমাম নিয়োগ করা নির্ধারিত হয়ে যায়।

তিনি তা’আলা বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“অবশ্যই আমরা আমাদের রাসুলগনকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমরা আরও নাযিল করেছি লোহা যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাকে ও তার রাসুলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিধর, পরাক্রমশালী।”[14]

আয়াতের দালিলিক দৃষ্টিকোণঃ আল্লাহ তা’আলা তার রাসুলগণকে عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং যারা তাদের অনুসরণ করে তাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারা যেন আল্লাহ তা’আলার কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে সে অনুযায়ী মানুষের

---

[14] সুরা হাদীদঃ ২৫

মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। এটা কেবলমাত্র শক্তি ও কর্তৃত্বের মাধ্যমেই হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন, তিনি লোহা নাযিল করেছেন। এব্যাপারে অনেক আয়াত রয়েছে।

বাস্তবতা হল আমরা যদি হুদুদ, ক্বিসাস এবং বান্দাদের কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধানের আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে অবশ্যই আমরা দেখতে পাব যে, একটি রাষ্ট্র ও একজন ইমাম প্রতিষ্ঠা করা উম্মাতের জন্য আবশ্যক।

সুন্নাহ'তে রয়েছে যা মুসলিম তার সহিহ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি বাইআতবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।"

হাদিসের দালিলিক দৃষ্টিকোণঃ ইমামকে বাইআত দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব। আর যা দ্বারা ওয়াজিব সম্পন্ন হয় সেটাও ওয়াজিব। একারণে উম্মাতের জন্য ইমাম নিয়োগ করা আবশ্যক। ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তবে শুধুমাত্র কতিপয় বিদআতি এব্যাপারে মতবিরোধ করেছে।

ইমাম হাইতামী বলেন, "আপনি আরো জেনে রাখুন, সাহাবীগণ একমত হয়েছেন যে, নবুওয়াতের যামানা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব। বরং তারা একে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হিসেবে নির্ধারণ করেছেন; যেহেতু তারা আল্লাহর রাসুল ﷺ কে দাফন করার চেয়ে এর প্রতি ব্যস্ত থেকেছেন।"[15]

ইমাম ইবনে হাযম رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "সকল আহলুস-সুন্নাহ, মুরজিয়া, শিয়া এবং সকল খারিজিরা ইমামত তথা নেতৃত্ব ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছে এবং উম্মাতের উপর ওয়াজিব হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ একজন

[15] আস-সওয়াইক্বুল মুহাররীক্বাহঃ ৭

ইমামের আনুগত্য করা - যিনি তাদের মাঝে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন এবং শারীয়াহ'র বিধি-বিধানের মাধ্যমে তাদের পরিচালনা করবেন যা আল্লাহর রাসুল ﷺ নিয়ে এসেছেন। তবে নাজদাতের খারিজিরা ব্যতীত।"[16]

ইমাম মাওয়ারদী رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "নেতৃত্বের চুক্তি করা ওয়াজিব যে এর দায়িত্ব নেয় তার জন্য। যদিও তাদের থেকে বধির ব্যতিক্রমী হয়।"[17]

[16] আল-ফাসলঃ ৪/৮৭

[17] আহকামুস-সুলত্বনীয়্যাহ

পরিচ্ছেদঃ

দাওলাতুল ইসলামের ইমাম নিয়োগের পদ্ধতি এবং সমষ্টিগতভাবে ইমামের শর্তসমূহ

দাওলাতুল ইসলামের ইমাম নিয়োগের জন্য দুইটি পদ্ধতি রয়েছে যে দুইটির ব্যাপারে আহলুল ইলমগণের মাঝে ইজমা রয়েছে।[18]

প্রথমঃ আহলুল-হাল্লী ওয়াল-আক্বদগণের মনোনীত করা; আলেম, নেতা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যাদের উপস্থিতি ও সমবেত হওয়া সহজতর হয়। তাদের মনোনীত করা এবং তার প্রতি তাদের আনুগত্য করা - যা ইমাম নিয়োগের মাক্বসাদ; তা হল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। আর আহলুল-হাল্লী ওয়াল-আক্বদগণের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে - এটা এর বিস্তারিত আলোচনার স্থান নয়।[19]

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ পূর্বের ইমামের দায়িত্ব অর্পণ করে যাওয়া; যাকে বলা হয় - “উত্তরাধিকারী করে যাওয়া”।

এখানে তৃতীয় আরেকটি ইজমাকৃত পদ্ধতি রয়েছে যার মাধ্যমেও নেতৃত্ব সংঘটিত হয়। তা হচ্ছে মুতাগাল্লিব বা পরাভূতকারীর নেতৃত্ব। তবে সূচনালগ্নে এটা মৌলিক কোন পন্থা অথবা নির্দেশিত কোন পদ্ধতি নয়। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এটা হয়ে থাকে।[20]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “যে ব্যক্তি তাদের উপর তরবারির মাধ্যমে জোরপূর্বক খলিফাহ হয় এবং তাকে আমিরুল মু’মিনীন

---

[18] দেখুন - আহকামুস-সুলত্বনীয়্যাহ লি-মাওয়ারদী এবং গিয়াছুল উমাম লিল-জুআইনী

[19] দেখুন - মিনহাজুস সুন্নাহ লি-ইবনে তাইমিয়্যাহ এবং নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহীল মিনহাজঃ ৭/৩৯০

[20] দেখুন - আল-গিয়াছীঃ ২৩১

হিসেবে বিশেষায়িত করা হয় আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এমন কারো জন্য তাকে ইমাম মেনে না নিয়ে রাত্রিযাপন করা বৈধ নয়।”[21]

হাফিজ ইবনে হাজার رَحِمَهُ الله বলেন, “ফক্বীহগণ মুতাগাল্লিব সুলতানের আনুগত্য করা ও তার সাথে থেকে জিহাদ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে এবং তার বিরুদ্ধে বের হওয়ার চেয়ে তার আনুগত্য করা উত্তম - এব্যাপারে একমত হয়েছেন। যখন এর মাঝে রক্ত ঝরানো নিবৃত্ত করা এবং সাধারণ মানুষকে শান্তি দেওয়ার মত বিষয় থাকে।”[22]

শাইখুল মুজাদ্দিদ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رَحِمَهُ الله বলেন, “প্রত্যেক মাজহাবের ইমামগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন, যে ব্যক্তি একটি অথবা একাধিক দেশ বিজয়ী হয় সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে তার জন্য ইমামের মত কর্তৃত্ব রয়েছে।”[23]

---

[21] আহকামুস সুলত্বনীয়্যাহ লি-আবী ইয়ালা - ২৩

[22] ফাতহুল বারী - ৪/৩৩

[23] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ - ১/৩৩৩

ইমামের শর্তসমূহঃ

ইমাম বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ رَحِمَهُاللهُ ইমামের শর্তের ব্যাপারে সারসংক্ষেপে বলেন, “ইমাম হবে পুরুষ, স্বাধীন, বালেগ, আক্বেল, মুসলিম, ন্যায়পরায়ণ, সাহসী, কুরাইশী, আলেম, উম্মাতকে পরিচালনা করা এবং তাদের কল্যাণাদির যে দায়িত্ব নিবে সে বিষয়ে যোগ্য হওয়া।”[24]

১. পুরুষ

২. স্বাধীন

৩. বালেগ

৪. আক্বেল

৫. মুসলিম

৬. ন্যায়পরায়ণ

৭. সাহসী

৮. কুরাইশী

৯. আলেম

১০. যে বিষয়ের দায়িত্ব নিবে সেব্যাপারে যোগ্য হওয়া।

গোত্রীয় জাতীয়তাবাদ অথবা দেশত্ববোধ জাতীয়তাবাদ অথবা তাগুতী রাষ্ট্রের সীমানার স্বীকৃতি দেওয়া ব্যতিরেকে - তা সম্মান করা তো দূরের ব্যাপার - অথবা যে অপবাদ দেওয়া হয় তা অস্তিত্বহীন হওয়া অথবা আকস্মিকভাবে ঘটা ছাড়া, যখন শারয়ী পদ্ধতি অনুসারে দাওলাহ এবং ইমামত তথা নেতৃত্ব পাওয়া যাবে তখন এটা ছাড়া অন্য আরেকটি (দাওলাহ) গঠন করা

[24] তাহরীরুল আহকাম ফী-তাদবীরি আহলিল ইসলামঃ ৫১

জায়েয নয়। ফক্বীহগণের পরিভাষায় একে বলা হয় - "একাধিক ইমাম হওয়া জায়েয নয়"।

পরিচ্ছেদঃ

একাধিক ইমাম হওয়া জায়েয নয়

নেতৃত্বের মহান উদ্দেশ্যসমূহের একটি হচ্ছে মুসলিমদের বিষয়াদি একত্রিত হওয়া। ক্ষুদ্র দলে হওয়া নয় এবং ইসলামী বিশ্বে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়া নয়। কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাতের সালাফগণের ইজমা একাধিক ইমাম জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ করে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

"আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিআমতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।"[25]

আয়াতের অর্থ একতা ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আদেশ করে এবং বিক্ষিপ্ততা,

[25] সুরা আলে-ইমরানঃ ১০৩

বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করে; স্বভাবত ঝগড়া-বিবাদ, দূর্বলতা এবং গর্হিত কাজ এর কারণে সৃষ্টি হয়। তাই এই আয়াত উম্মাতে ইসলামিয়্যাহ'র একতা ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবশ্যকীয়তা প্রমাণ করে। এটা সহজ হবে যখন এই উম্মাতের ইমাম হবেন কেবলমাত্র একজন। আর যার দ্বারা ওয়াজিব সম্পন্ন হয় সেটাও ওয়াজিব।

সুন্নাহ'তে রয়েছে, আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "যখন দুইজন খলিফাহ'কে বাইআত দেওয়া হবে তখন তোমরা শেষের জনকে হত্যা করবে।"[26] সুতরাং শেষের জনকে হত্যার আদেশ প্রমাণ করে যে, একই সময়ে দুইজন ইমাম নিয়োগ করা হারাম। কেননা হত্যা করা শুধুমাত্র এমন কবিরাহ গুনাহের কারণে হয় যার ভয়াবহতা বিপদজনকভাবে বেড়ে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত তিনি নাবী ﷺ কে বলতে শুনেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বাইআত দিল এবং এতে তাকে নিজ প্রতিশ্রুতি ও অন্তস্তল থেকে অঙ্গীকার প্রদান করল তার উচিত, যথাসাধ্য তার (সেই ইমামের) আনুগত্য করা। এরপর যদি অন্য আরেকজন এসে তার বিরোধিতা করে, তাহলে ঐ দ্বিতীয় জনের গর্দান উড়িয়ে দিবে।"[27]

আবু হাযিম বলেন, "আমি পাঁচ বছর আবু হুরায়রার সঙ্গী ছিলাম। আমি তাকে নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "বানী-ইসরাঈলদের পরিচালনা করতেন নাবীগণ। যখনই কোন নাবী মৃত্যুবরণ করতেন, তখনই অন্য আরেকজন নাবী তার প্রতিনিধি হতেন। (জেনে রাখ) আমার পর কোন নাবী নেই, বরং আমার পর অনেক সংখ্যক খলিফাহ হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ

---

[26] মুসলিমঃ ১৮৫৩

[27] মুসলিম

দিচ্ছেন? তিনি বললেন, যার নিকট প্রথমে বাইআত দেবে, তা পালন করবে। তারপর যার নিকট বাইআত দেবে, তা পালন করবে। অতঃপর তাদের অধিকার আদায় করবে এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে। কারণ, মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রজাপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।”[28]

ইমাম মাওয়ারদী رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “একই সময়ে এবং একই দেশে দুইজন ইমাম নিয়োগ করা ঐক্যমতে জায়েয নয়।”[29]

তিনি আরো বলেন, “যখন দুই দেশে দুইজন ইমামের জন্য নেতৃত্বের চুক্তি করা হবে তখন তাদের দু'জনের নেতৃত্ব সম্পন্ন হবে না। কারণ উম্মাতের জন্য একই সময়ে দুইজন ইমাম থাকা জায়েয নয়। যদিও কিছু ব্যতিক্রমী লোক এটাকে জায়েয বলেছেন।”[30]

ইমাম ইবনে হাযম رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “নেতৃত্ব থাকা ফরয হওয়ার ব্যাপারে আমাদের বর্ণনা একমত হয়েছে যে, পৃথিবীতে একই সময়ে দুইজন ইমাম থাকা জায়েয নেই। কেবলমাত্র এক নেতৃত্বই জায়েয।”[31]

ইমাম নববী رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “আলেমগণ এব্যাপারে একমত যে, একই সময়ে দুইজন খলিফাহ'র জন্য চুক্তি করা জায়েয নয় - দারুল ইসলাম তথা ইসলামের ভূমি বিস্তৃত হোক অথবা না হোক তা সমান।”[32]

---

[28] মুত্তাফাকুন আলাইহি

[29] আদাবুদ দুনইয়া ওয়াদ দ্বীনঃ ১৩৬

[30] আহকামুস সুলত্বনিয়্যাহঃ ৯

[31] আল-ফাসলঃ ৪/৭৮

[32] আল-ফাসলঃ ৪/৭৮

পরিচ্ছেদঃ

বাইআতের পরিচয়

বাইআতঃ

ক্রিয়ামূল - অমুক খলিফাহ'কে বাইআত দিয়েছে। এর অর্থ হল - পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। আল্লামা ইবনে মানযুর رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “বাইআত হচ্ছে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। যেমন তাদের প্রত্যেকের মালিকানায় যা আছে তা বিক্রি করে দিবে এবং তার নিজের একনিষ্ঠতা, তার আনুগত্য ও তার কর্মের অভ্যন্তরীণ অধিকার তাকে দিয়ে দিবে।”[33]

আল্লামা ইবনে খালদুন رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “আপনি জেনে রাখুন, বাইআত হচ্ছে আনুগত্য করার উপর প্রতিজ্ঞা করা। যেমন বাইআতকারী তার আমীরের নিকট এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে তার নিজের বিষয় এবং মুসলিমদের বিষয়াদি বিবেচনা করার অধিকার আমীরের জন্য সমর্পণ করবে, সে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করবে না এবং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সাধ্যানুযায়ী আদেশের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করবে।”[34]

অতএব বাইআত হল এমন প্রতিশ্রুতি যা আনুগত্য ও মান্য করার জন্য শারয়ীসম্মত ইমাম এবং মুসলিমদের খলিফাহ'র নিকট দেওয়া হয়। বাইআতের শব্দগুলো এই পরিচয়কেই বুঝায় যখন এ শব্দগুলো প্রয়োগ করা হয়।

বুখারি এবং মুসলিমে উবাদাহ ইবনে সামিত رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, “আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ কে এই মর্মে বাইআত

---

[33] লিসানুল আরব - শব্দ ‘আল-বাইউ’ ৮/২৬

[34] মুক্বাদ্দামাতু ইবনে খালদুনঃ ২০৯

দিয়েছি যে, সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) অগ্রাধিকার দেওয়া অবস্থায় আমরা তার আনুগত্য করব এবং আমরা তার কর্তৃত্বশীলদের বিরোধিতা করব না যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরি দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল রয়েছে।" অন্য আরেক বর্ণনায় রয়েছে - "আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।"[35]

বাইআতের শব্দসমূহের ব্যাখ্যাঃ

তার উক্তিঃ "সুখে দুঃখে" অর্থাৎ আমরা সম্পদের ক্ষেত্রে অসচ্ছল হই অথবা সম্পদশালী হই তা সমান। আমাদের ধনী-গরিব সকলের উপর ওয়াজিব হচ্ছে আমরা আমাদের ওলীল-আমর তথা কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করব এবং তাকে মান্য করব।

তার উক্তিঃ "ইচ্ছায় অনিচ্ছায়" অর্থাৎ আমরা এব্যাপারে অনিচ্ছুক হই - আমাদের এমন বিষয়ে আদেশ করা হল যা আমরা পছন্দ করছি না এবং যা চাচ্ছি না - অথবা আমরা এব্যাপারে আগ্রহী হই - আমাদের এমন বিষয়ে আদেশ করা হল যা আমাদের অনুকূলে এবং উপযোগী হয় - তা সমান। ইমাম নববী رَحِمَهُ اللهُ সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেন, "আলেমগণ বলেছেন, যা কষ্টসাধ্য হয়, অন্তর অপছন্দ করে এবং এমন অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করা ওয়াজিব - যদি তা গুনাহের কাজ না হয়। আর যদি তা কোন গুনাহের কাজ হয় তাহলে কোন আনুগত্য ও মান্যতা নেই।"

তার উক্তিঃ "আমাদের উপর (অন্যদেরকে) অগ্রাধিকার দেওয়া অবস্থায়" অগ্রাধিকার হচ্ছেঃ "দুনিয়াবি কর্তৃত্বের একচ্ছত্র অধিকার এবং সংশ্লিষ্টতা আপনাদের উপরেই" অর্থাৎ আপনারা শ্রবণ করুন এবং আনুগত্য করুন - যদিও আমীরগণ দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হয় এবং তাদের নিকট থাকা

[35] বুখারিঃ কিতাবুল ফিতান, মুসলিমঃ কিতাবুল ইমারাহ

আপনাদের হক্ব আপনাদের কাছে তারা পৌঁছে না দেয়।

তার উক্তিঃ “যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরি দেখ” কাযী ইয়ায বলেন, “আলেমগণ এব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কোন কাফিরের জন্য নেতৃত্ব সম্পন্ন হয় না এবং যদি তার উপর কুফর আপতিত হয় তাহলে সে অপসারিত হয়ে যাবে।” তিনি আরো বলেন, “যদি তা - অর্থাৎ তাকে অপসারণ করার সক্ষমতা - কোন দলের থাকে তখন কাফিরকে অপসারণ করার দায়িত্ব নেওয়া তাদের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়।”[36]

এই হাদিস সর্বাবস্থায় শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার প্রতি অনুপ্রাণিত করে। এর কারণ হচ্ছে মুসলিমদের কালিমা (মত) এক হওয়া। কেননা মতভেদ তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা নষ্ট হওয়ার একটি কারণ।[37]

বাইআত ভঙ্গের হুকুমঃ

প্রতিশ্রুতি ও ইমামের বাইআত পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে এবং বাইআত ভঙ্গ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অনেক নছ বর্ণিত হয়েছে - তবে যদি আমরা প্রকাশ্য কুফর প্রত্যক্ষ করি। বাইআত ভঙ্গ করা একটি গুরুতর বিষয় এবং কবিরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তা’আলা বলেন,

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾

“আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।”[38]

---

[36] শরহু সহিহ মুসলিম লিন-নববীঃ ৬/৩১৪

[37] নববী শরহু সহিহ মুসলিমে এটা বলেছেন

[38] সুরা ইসরাঃ ৩৪

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ﴾

"হে মু'মিনগন! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করবে।"[39]

তিনি তা'আলা বলেন,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

"আর তোমরা যখন অঙ্গীকার কর তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। তোমরা তাকীদযুক্ত অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করো না এবং প্রকৃতপক্ষে তোমরা নিজদের জন্য আল্লাহকে জিম্মাদার বানিয়েছো। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, যা তোমরা কর।"[40]

ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার আমীর তথা শাসকের থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখবে সে যেন এব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে। কারণ কেউ জামাআতের বাইরে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।"[41] ইবনে আবী হামযাহ বলেন, "বিচ্ছিন্ন হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ আমীরের অর্জিত বাইআত নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা।"

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত নাবী ﷺ

[39] সুরা মায়িদাহঃ ১

[40] সুরা নাহলঃ ৯১

[41] মুত্তাফাক্কুন আলাইহি

বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন ইমামকে বাইআত দিল এবং এতে তাকে নিজ প্রতিশ্রুতি ও অন্তস্তল থেকে অঙ্গীকার প্রদান করল তার উচিত, যথাসাধ্য তার (সেই ইমামের) আনুগত্য করা। এরপর যদি অন্য আরেকজন এসে তার বিরোধিতা করে, তাহলে ঐ দ্বিতীয় জনের গর্দান উড়িয়ে দিবে।”[42]

আবু হামযাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রার সাথে পাঁচ বছর ছিলাম। আমি তাকে নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “বানী-ইসরাঈলদের পরিচালনা করতেন নাবীগণ। যখনই কোন নাবী মৃত্যুবরণ করতেন, তখনই অন্য আরেকজন নাবী তার প্রতিনিধি হতেন। (জেনে রাখ) আমার পর কোন নাবী নেই, বরং আমার পর অনেক সংখ্যক খলিফাহ হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, যার নিকট প্রথমে বাইআত দেবে, তা পালন করবে। তারপর যার নিকট বাইআত দেবে, তা পালন করবে। অতঃপর তাদের অধিকার আদায় করবে এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে। কারণ, মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রজাপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।”[43]

ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি বাইআতবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।”[44]

---

[42] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি

[43] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি

[44] মুসলিম বর্ণনা করেছেন

পরিচ্ছেদঃ

শারয়ী পরিভাষায় দাওলাহ’র উপাধি এবং এর ইমামের উপাধি

বিগত অধ্যায়গুলোতে আলোচিত পদ্ধতি অনুসারে কর্তৃত্ব বাস্তবায়িত হয়। ইতোপূর্বে আলোচিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দাওলাহ’কে শারয়ী পরিভাষায় অনেকগুলো উপাধিতে অভিহিত করা হয়। ফলে দাওলাহ’কে “ইমামাতুল উযমা”, “ইমামাতুল কুবরা”, “খিলাফাহ” এবং “ইমারাহ” উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়। আর দাওলাহ’র পরিচালককে “ইমাম”, “খলিফাহ”, “আমিরুল মু’মিনীন” এবং “ওলী বা কর্তৃত্বের অধিকারী উলিল-আমর” উপাধিতে অভিহিত করা হয়।

ইমাম ইবনে জামাআহ رَحِمَهُ الله বলেন, “ইমারাহ বা নেতৃত্ব দুই প্রকারঃ আম এবং খাছ। আম ইমারাহ হল খিলাফাহ - যার প্রধানকে ‘আমিরুল মু’মিনীন’ বিশেষণ দেওয়া হয়। খলিফাগণের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম এ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে ওমর ইবনুল খাত্তাবকে - যখন তিনি খিলাফাহ’র দায়িত্ব নেন। ফলে এটাই নির্দিষ্টভাবে খলিফাদের রীতি হয়ে যায়।” তিনি رَحِمَهُ الله আরো বলেন, “যার জন্য বাইআতের চুক্তি করা হয় তাকে খলিফাহ উপাধিতে অভিহিত করা এবং খলিফাতু রাসুলিল্লাহ বলা জায়েয। কারণ সে তার উম্মাতের মধ্যে খলিফাহ।”[45]

ইমাম নববী رَحِمَهُ الله বলেন, “ইমামকে খলিফাহ, ইমাম এবং আমিরুল মু’মিনীন বলা জায়েয।”[46]

ইমাম মাওয়ারদী رَحِمَهُ الله বলেন, “নেতৃত্ব গঠন করা হয়েছে দ্বীনের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং দ্বীন দ্বারা দুনিয়া পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নবুওয়াতের

---

[45] তাহরীরুল আহকাম

[46] রওদাতুত-ত্বলিবীনঃ ১০/৪৯

প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।”[47]

আল্লামা ইবনে খালদুন رَحِمَهُ اللهُ বর্ণনা করেন, শাসন পদ্ধতি যখন “সাধারণ মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের ব্যাপারে শারয়ী বিবেচনার চাহিদার’ ভিত্তিতে হয় তখন সেটা হল খিলাফাহ। ‘আর প্রকৃতপক্ষে খিলাফাহ হল দ্বীনের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং দ্বীন দ্বারা দুনিয়া পরিচালনা করার ক্ষেত্রে শারীয়াহ প্রণেতার প্রতিনিধিত্ব করা।” অতঃপর তিনি বলেন, “একে খিলাফাহ এবং ইমামত তথা নেতৃত্ব নামে অভিহিত করা হবে। আর এর পরিচালককে খলিফাহ এবং ইমাম বলে আখ্যায়িত করা হবে।”[48]

---

[47] আহকামুস সুলত্বনিয়্যাহ

[48] মুকাদ্দামাতু ইবনে খালদুনঃ ১৯১

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দলসমূহ

- ব্যাপকভাবে - মুজাহিদদের এবং - বিশেষভাবে - দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি জানা উচিৎ তা হচ্ছে মুসলিম ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শক্তিশালী দলসমূহের বিধান জানা। কারণ এ দলগুলোর মধ্য থেকে যে তাদের দাওলাহ'র সাথে যুদ্ধ করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাদের লক্ষ্য। তাই এ দলগুলোর বাস্তবতা এবং গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলাসমূহের ব্যাপারে তাদের অবহিত হওয়া আবশ্যক। যেন তারা তাদের ব্যাপারে সঠিক পথপ্রাপ্ত এবং দূরদর্শিতা সম্পন্ন হয় - যাতে ঐ দলগুলোর সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে অজ্ঞতাবশত কোন ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি না হয়।

প্রারম্ভিকাঃ

শোনা, মানা (আনুগত্য করা) এবং ইমামের কতিপয় দায়িত্ব ও তার অধিকারের আলোচনা

তিনি তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের। অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামাত দিবসের উপর ঈমান এনে থাক। আর এটাই পরিণতির দিক দিয়ে কল্যাণকর এবং উত্তম।"[49]

আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত নাবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করল, সে আমারই আনুগত্য করল। আর যে আমীরের অবাধ্যতা করল সে আমারই অবাধ্যতা করল।"[50]

তিনি رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "তুমি অবশ্যই আমীরের কথা শুনবে এবং মানবে (পূর্ণ আনুগত্য করবে) তোমার সংকট কালে ও সাচ্ছন্দ্যের সময়, অনুরাগ ও বিরাগে এবং যখন তোমার উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে তখনও।"[51]

ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "পাপ কাজের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নির্দেশ শোনা এবং আনুগত্য করা মুসলিম ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য; চাই তার মনঃপূত হোক বা না হোক। আর যখন পাপকাজের নির্দেশ দেওয়া হবে তখন নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা হবে না।"[52]

---

[49] সুরা নিসাঃ ৫৯

[50] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি

[51] মুসলিম বর্ণনা করেছেন

[52] মুসলিম বর্ণনা করেছেন

আবু যার رَضِيَاللَّهُعَنْهُ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “আমার বন্ধু আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাকে আমীরের তথা নেতার আদেশ শুনতে ও মানতে আদেশ করেছেন যদিও সে একজন হাত-পা কাটা ক্রীতদাস হয়।”[53] বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, “যদিও কোন হাবশী আমীর হয় যার মাথা কিসমিসের মতো।”

“হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান رَضِيَاللَّهُعَنْهُ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “লোকজন আল্লাহর রাসুল কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন আর ﷺ আমি তাকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম; এই ভয়ে যেন আমি ঐ সবের মধ্যে না পরি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা জাহিলীয়্যাতে অকল্যাণের মধ্যে জীবন যাপন করতাম অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের এ কল্যাণ দান করেছেন। এই কল্যাণের পর আবার কোন অকল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ অকল্যাণের পর কোন কল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। তবে তা ধূম্রময়। আমি বললাম, ধূম্রময় কী? তিনি বললেন, এমন একদল লোক যারা আমার সুন্নাহ ত্যাগ করে রীতিনীতি তৈরি করবে এবং আমার হিদায়াত বাদ দিয়ে অন্যপথে পরিচালিত করবে। তাদের কাজে ভাল-মন্দ সবই থাকবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কি আর কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, তখন জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী দা’য়ীদের উদ্ভব ঘটবে - যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! এদের পরিচয় বর্ণনা করুন! তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় পরে যাই তাহলে আপনি আমাকে কী করতে আদেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামাআত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, যদি মুসলিমদের কোন জামাআত ও ইমাম না থাকে? তিনি বলেন, তখন তুমি তাদের সকল দল উপদলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং মৃত্যু না আসা

[53] মুসলিম বর্ণনা করেছেন

পর্যন্ত বৃক্ষমূল দাঁতে আঁকড়ে ধরে হলেও তোমার দ্বীনের উপর থাকবে।”[54]

ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার আমীর তথা শাসকের থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখবে সে যেন এব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে। কারণ কেউ জামাআতের বাইরে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, সে জাহিলী মৃত্যু বরণ করল।”[55] অন্য এক বর্ণনায় রয়েছেঃ “সে আসলে তার ঘাড় থেকে ইসলামের গলরশি খুলে ফেলল।”

আউফ ইবনে মালিক رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত তিনি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “তোমাদের মধ্যে ঐ শাসকই সর্বোত্তম, যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারা তোমাদের ভালোবাসে। তোমরা তাদের জন্য দু’আ করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দু’আ করে। আর তোমাদের মধ্যে ঐ শাসকই সর্বনিকৃষ্ট, যাদের প্রতি তোমরা ক্রোধান্বিত হও এবং তারাও তোমাদের প্রতি ক্রোধ ও শত্রুতা পোষণ করে। আর তাদের প্রতি তোমরা অভিসম্পাত করো এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! এমতাবস্থায় কি আমরা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করব না? তিনি বললেনঃ না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে সালাত প্রতিষ্ঠা করে। জেনে রেখো, যে ব্যক্তিকে তোমাদের প্রতি শাসক নিয়ুক্ত করা হয় আর তার মধ্যে যদি আল্লাহ তা’আলার নাফরমানি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে তার সে নাফরমানির কাজটি অপছন্দ কর, কিন্তু তার আনুগত্য থেকে পিছপা হবে না।”[56]

---

[54] মুত্তাফাক্কুন আলাইহি

[55] মুত্তাফাক্কুন আলাইহি

[56] মুসলিম বর্ণনা করেছেন

জামাআত আঁকড়ে ধরা এবং ইমামগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার হিকমা যদিও তারা অত্যাচার করেঃ

ইমামগণের আনুগত্যে লেগে থাকা যদিও তারা অত্যাচার করে। কারণ তাদের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে যে অনিষ্টতা সৃষ্টি হয় তা তাদের অত্যাচার থেকে সৃষ্ট অনিষ্টতার চেয়ে বহুগুণ। বরং তাদের অত্যাচারের উপর ধৈর্যধারণ করার মধ্যে রয়েছে গুনাহের কাফফারা এবং প্রতিদান দ্বিগুণ হওয়া। 'ফুরু'এর লেখক ইমাম আহমাদ থেকে ইমামগণের - যদিও তারা অত্যাচার করে - বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নক্বল করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বিদআত সুন্নাহ বিরোধী।[57]

ইমামের দায়িত্বসমূহঃ

সংক্ষিপ্তভাবে ইমামের দায়িত্বের ব্যাপারে গবেষণায় আমরা দেখতে পাই, তা দুইটি বিষয়ের আশেপাশে ঘুরাফেরা করেঃ "দ্বীনের নিরাপত্তা রক্ষা করা" এবং "দ্বীন দ্বারা দুনিয়া পরিচালনা করা"। প্রাচীন ও আধুনিক শারয়ী রাষ্ট্রনীতির কিতাবগুলোতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো হচ্ছেঃ

প্রথম দায়িত্বঃ জীবনের সকল বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, দ্বীনে ইসলামের দিকে দাওয়াহ দেওয়া, দ্বীন রক্ষা করা ও একে সাহায্য করা, সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং মুনাফিক্ব ও বিদআতিদের মোকাবেলা করা যারা যমিনে বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় দায়িত্বঃ মানুষের মাঝে ন্যায়ভাবে বিচার-ফায়সালা করা, ঝগড়া-বিবাদের সিদ্ধান্ত দেওয়া, প্রাপ্যদের নিকট অধিকার পৌঁছে দেওয়া, মাজলুমকে সাহায্য করা এবং বিচারিক নির্দেশ কার্যকর করা।

তৃতীয় দায়িত্বঃ দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিস্তৃত করা ও দেশের সকল অংশে দাওলাহ'র ক্ষমতা ছড়িয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য হচ্ছে

[57] দেখুন - আল-ইনসাফ লিল-মাওয়ারদী - ১০/২৭২

নিরাপদ ব্যক্তিদের আরাম বিনষ্টকারী ও সীমালজ্ঘনকারীদের এবং তাদের উপর অত্যাচার করাকে বাধা প্রদান করা। যাতে করে মানুষ নিরাপত্তার নি'আমতে তাদের বাসস্থানে, তাদের কাজ-কর্মে ও তাদের সফরে সুখী জীবন-যাপন করতে পারে।

চতুর্থ দায়িত্বঃ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, সামরিক প্রস্তুতি নেওয়া, বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র-সস্ত্র তৈরি করা, জিহাদে সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, শত্রুদের থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য তাদেরকে জিহাদী ঈমানী তরবিয়ত দেওয়া এবং শত্রুদের দেশে তাদের আক্রমণ করা।

পঞ্চম দায়িত্বঃ দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করা, কৃষি, ব্যবসা, শিল্প এবং অন্যান্য বিষয় থেকে জীবিকা পদ্ধতি ও কর্মসংস্থান করে দেওয়া, বায়তুল-মালের জন্য যাকাত সংগ্রহ করা, সার্বজনীন সম্পদের শারয়ী খাতসমূহে তা ব্যায় করা, বায়তুল-মাল থেকে পরিপূর্ণভাবে মানুষের অধিকার প্রদান করা, অভাবগ্রস্ত ও প্রয়োজনগ্রস্তদের সহায়তা করা, তাদের প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া, তাদের অবস্থাদির খোঁজ-খবর নেওয়া এবং প্রজাসাধারণের প্রতি দয়া করা ও তাদের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করা।

ষষ্ঠ দায়িত্বঃ বিশ্বস্ত কল্যাণকামী ও কার্যে দক্ষদের মধ্য থেকে আমীর, মন্ত্রী এবং কর্মচারীদের নিয়োগ দেওয়া - যারা দাওলাতুল ইসলাম ও মানুষের বিষয়াদি রক্ষা করা এবং সার্বজনীন সম্পদ সংরক্ষন করার ব্যাপারে আস্থাভাজন হয়।

সপ্তম দায়িত্বঃ দাওলাহ'র কার্যক্রম ইমামের পর্যবেক্ষণ করা। যাতে করে সে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা, রাষ্ট্র পরিচালনা, রাষ্ট্রের বিষয়াদি পরিবর্তন করা এবং দেশ ও প্রজাসাধারণের অবস্থাদি খোঁজ করার ক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়। বরং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা, দেশের বিষয়াদি সহজকরণ, মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আমীর ও মন্ত্রীদের কর্মের ব্যাপারে তাদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সে নিজেই দায়িত্ব নিবে। কেননা তার ব্যস্ততা ও

অলসতার দরুন আল্লাহ তার উপর যা ওয়াজিব করেছেন তা থেকে তিনি দায়িত্ব মুক্ত হন না। ওমর ইবনে খাত্তাব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন, "ফুরাত নদীর উপকূলে যদি একটি বকরী মারা যায় তাহলে আমি মনে করি, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্বিয়ামতের দিন এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন।" আবু নুআইম হিলয়াতে বর্ণনা করেছেন।[58]

ইমামের হক্ব বা অধিকারঃ

কুরআন ও সুন্নাহ'তে প্রমাণিত মুসলিম ইমামের কতিপয় হক্ব রয়েছে এবং এগুলো ইমামগণের কিতাবাদিতে ছড়িয়ে আছে। এর মধ্যে রয়েছেঃ

প্রথমতঃ ভালো কাজের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা। যেমন তিনি তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের। অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ ও ক্বিয়ামাত দিবসের উপর ঈমান এনে থাক। আর এটাই পরিণতির দিক দিয়ে কল্যাণকর এবং উত্তম।"[59]

---

[58] দেখুন - সিয়াসাতুশ-শারইয়্যাহ লি-আবী ওমর আস-সাইফঃ ৮৬

[59] সুরা নিসাঃ ৫৯

ইবনে জারীর এবং অন্যরা আলী ইবনে আবি তালিব رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "ইমামের উপর হক্ব হচ্ছে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার-ফায়সালা করা এবং আমানত পৌঁছিয়ে দেওয়া। যখন সে এটা করবে তখন মানুষের উপর হক্ব হচ্ছে তাকে মান্য করা ও তার আনুগত্য করা এবং যখন তাদের ডাকা হবে তখন সাড়া দেওয়া।" এই অধ্যায়ে অনেক হাদিস রয়েছে। এর কিছু পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কল্যাণ ও আল্লাহ ভীতির কাজে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। তিনি তা'আলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

"নেককাজ ও আল্লাহ ভীতির কাজে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একজন অন্যজনকে সাহায্য করবে না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।"[60]

আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত তিনি তার খিলাফাহ'র খুতবায় বলেন, "অতঃপর হে লোকসকল! আপনাদের উপর আমাকে শাসক বানানো হয়েছে। আর আমি আপনাদের চেয়ে উত্তম নই। তাই আমি যদি ভালো কাজ করি তাহলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন। আর যদি আমি ভুল করি তাহলে আপনারা আমাকে সংশোধন করে দিবেন।"[61]

তৃতীয়তঃ তার কল্যাণ কামনা করা। তামীম ইবনে আউস আদ-দারী থেকে সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে - "দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করা। আমরা

---

[60] সুরা মায়িদাহঃ ২

[61] তারীখে বাগদাদীঃ ৩/২১০

বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তার কিতাবের জন্য, তার রাসুলের জন্য, মুসলিমদের ইমামগণ তথা শাসকগণের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য।”

মুহাম্মাদ ইবনে যুবাইর ইবনে মুতঈম থেকে বর্ণিত তিনি তার পিতা যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আল্লাহর রাসুল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, “জেনে রাখ, তিনটি বিষয়ে মু’মিনের অন্তর খিয়ানত করে নাঃ ১. একমাত্র আল্লাহর জন্য আমলকে বিশুদ্ধ করা, ২. কর্তৃত্বশীল তথা শাসকের আনুগত্য করা, ৩. জামাআতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা, তাদের দু’আ তাদের পিছনে থেকেও হয়ে থাকে।”[62]

চতুর্থঃ তাকে শ্রদ্ধা করা, মর্যাদা দেওয়া এবং সম্মান করা। তিনি ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি শাসককে অপমান করবে, আল্লাহ তাকে অপমানিত করবেন।”[63] আবু মুসা আশআরী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, “পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক মুসলিমকে, কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এমন কুরআনের বাহককে (হাফিয ও আলিম) এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা এক প্রকার আল্লাহ তা’আলাকেই সম্মান করা।”[64]

মু’আয رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি এগুলোর একটি সম্পাদন করবে আল্লাহর নিকট তিনি তার জন্য জামিনদার হবেন; যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেল অথবা জানাযায় শরীক হল অথবা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বের হল অথবা ইমামকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার

---

[62] আহমাদ

[63] তিরমিযীঃ হাসান

[64] আবু দাউদ

উদ্দেশ্যে তার সাথে সাক্ষাৎ করল অথবা সে তার বাড়িতে অবস্থান করল ফলে মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকে এবং সেও নিরাপদ থাকে।”[65]

পঞ্চমঃ তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা, তাকে ধোঁকা দেওয়া, তার সাথে গাদ্দারী করা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। এব্যাপারে নছ (বক্তব্য) পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[65] আহমাদ

পরিচ্ছেদঃ

আত-ত্বইফাতুল মুমতানিআহ (নিবৃত্ত দল)

ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র পরিচয়ঃ

ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত দল, অতঃপর শক্তি ও প্রভাবের মাধ্যমে ইসলামের বিধানসমূহের মধ্য থেকে প্রকাশ্য কোন বিধান পালন করা থেকে বিরত থাকে। যদিও এর হুকুমের ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয়।

ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র উদাহরণঃ

যেমন যদি কোন দল যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে অথবা সিয়াম পালন করা থেকে অথবা ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করা থেকে বিরত থাকে - যদিও তারা এগুলো ওয়াজিব হওয়ার স্বীকৃতি দেয় - অথবা যদি তারা প্রকাশ্য হারাম যেমন সুদ, মদ, ও ব্যভিচার পরিত্যাগ না করে - যদিও তারা এগুলা হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্বীকৃতি দেয় - এবং আমরা কেবল যুদ্ধের মাধ্যমেই তাদেরকে এগুলো পালনে বাধ্য করতে সক্ষম হব অথবা তারা এমন ক্ষমতা ও শক্তিসম্পন্ন যার মাধ্যমে তারা প্রকাশ্য বিধান পালন করা থেকে বিরত থাকে - যদিও তারা কার্যত যুদ্ধে নিয়োজিত না হয়।

ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র হুকুমঃ

ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র হুকুম হচ্ছে রিদ্দাহ এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া। দলিল হল সাহাবীগণের رَضِيَ اللهُ عَنْهُم ইজমা - যা দলিলের ভিত্তি। কেননা তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের মুরতাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "এই সকল ব্যক্তিদের কুফর এবং রিদ্দায় অন্তর্ভুক্ত করা সাহাবীগণের ঐক্যমত দ্বারা প্রমাণিত যা কুরআন এবং সুন্নাহ'র বক্তব্যের উপর নির্ভর করে।"

তিনি আরো বলেন, “যারা হক্বের অনুসরণ করার ইচ্ছা করে তাদের সম্পর্কে তাকফিরের এবং যুদ্ধের মাস’আলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সংশয়কে ভেঙ্গে দেয়, তা হল যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের হত্যা করার ব্যাপারে এবং তাদেরকে মুরতাদদের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা।”

ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুমঃ

ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা প্রমাণ করে। তিনি তা’আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ﴾

“আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনাহ নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।”[66]

সুতরাং যখন দ্বীনের কিছু অংশ আল্লাহর জন্য হবে এবং দ্বীনের অন্য অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য হবে তখন যুদ্ধ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়।

সহিহাইনে রয়েছে ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, “আমাকে মানুষের সাথে লড়াই করার আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল, তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে। তাই যখন তারা এটা করবে তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের হক্ব ব্যতীত, আর এর হিসাব আল্লাহর নিকট।”

আবু বকর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন, “যাকাত হল সম্পদের হক্ব। আল্লাহর

[66] সুরা আনফালঃ ৩৯

কসম যদি তারা আমাকে একটি উটের বাচ্চা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে যা আল্লাহর রাসুল ﷺ এর নিকট তারা আদায় করত, তাহলে অবশ্যই তা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব।”

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, “আলেমগণ এব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, ইসলামী শারয়ী বিষয়সমূহের কোন মুতাওয়াতির শারয়ী বিষয় থেকে নিবৃত্ত প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়। যেমন হারবী যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আরো বেশি অগ্রগণ্য।”[67]

সুতরাং যখন এটা হবে এমন দলের হুকুম - যারা ইসলামী শারয়ী বিষয়সমূহের একটি বিষয় থেকে বিরত থেকেছে, এমতাবস্থায় ঐ দলের অবস্থা কেমন হবে যারা ইসলামী শারীয়াহ’র অধিকাংশ বিষয় থেকে বিরত থাকে। বরং ঐ দলের অবস্থা কেমন হবে যারা আল্লাহর শারীয়াহ পালন না করার ঘোষণা দেয় গণতান্ত্রিক নিয়ম ও গঠনকৃত মূলনীতি প্রতিস্থাপন করার মাধ্যেমে।

ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র সহকারী ও সাহায্যকারীদের হুকুমঃ

ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র সাহায্যকারীদের হুকুম সমানভাবে দলের হুকুমের মতই। অর্থাৎ তাদের হুকুম রিদ্দাহ, দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। কারণ যে ব্যক্তি কোন দলের সাথে ওয়ালা (সম্পর্ক) করে তার জন্য ঐ দলের হুকুম প্রযোজ্য।

তিনি তা’আলা বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ

[67] আল-ফাতাওয়া আল-কুবরাঃ কিতাবুল হুদুদ

اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۞

“মু’মিনগণ যেন মু’মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। আর যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্কে থাকবে না।”[68] শাইখুল মুফাসসিরীন ইবনে জারীর আত-ত্ববারী رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “আর যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্কে থাকবে না - এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে - সে আল্লাহর থেকে মুক্ত এবং আল্লাহর দ্বীন থেকে সে ফিরে যাওয়ার কারণে ও কুফরে প্রবেশ করার কারণে তিনি তার থেকে মুক্ত।”

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞

“হে মু’মিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।”[69] ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে - “তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।” “অর্থাৎ কুফরের হুকুমের ক্ষেত্রে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।”

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “যেহেতু দলের একজন অপরজনকে সাহায্য করে ফলে তারা নিবৃত্ত হয় তখন প্রতিদান ও শাস্তির ব্যাপারে তারা অংশীদার...... আর ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র

---

[68] সুরা আলে-ইমরানঃ ২৮

[69] সুরা মায়িদাহঃ ৫১

সহায়তাকারী এবং সাহায্যকারীরা এর অন্তর্ভুক্ত। দলের সদস্যদের জন্য যে হুকুম সাহায্যকারীদের জন্য একই হুকুম...... কারণ একটি দলের এক অংশ অন্য অংশের মাধ্যমে বিরত থাকে যেমন একটি দেহ।”[70]

তিনি ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র ব্যাপারে আরো বলেন, “বাহিনীর নেতাদের এবং নেতা ব্যতীত অন্যদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের তথা ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র দিকে ধাবিত হয় তার হুকুম তাদের হুকুমের মতই। তাদের মধ্যে ইসলামী বিধি-বিধান থেকে নিবৃত্ত থাকার (রিদ্দাহ’র) যে অংশ রয়েছে সমানুপাতে সেও ইসলামের বিধি-বিধান থেকে নিবৃত্ত রয়েছে। সালাফগণ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের মুরতাদ হিসেবে আখ্যায়িত করতেন - সাথে সাথে তারা সালাত আদায় করত, সিয়াম পালন করত এবং তারা মুসলিমদের জামাআতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি - তাহলে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেমন হবে যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের শত্রুদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে?”[71]

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুম অথচ তাদের মাঝে মুকরাহ তথা বাধ্য রয়েছেঃ

এই মাস’আলার অধিনে দুইটি অবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়ঃ

প্রথম অবস্থাঃ তাদের মাঝে বাধ্য কোন ব্যক্তি রয়েছে - এ বিষয়টি আমাদের জানা না থাকাঃ তখন আমরা বাহ্যিকতার ভিত্তিতে তাদের সাথে আচরণ করব, আমরা তাদের সকলের সাথে যুদ্ধ করব এবং তাদের গোপন বিষয়গুলো আল্লাহর নিকট ছেড়ে দিব। আর এই হুকুম আহলুল ইলমগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে।[72]

---

[70] ফাতাওয়াঃ ২৮/৩১১

[71] ফাতাওয়াঃ ২৮/৫৩০

[72] দেখুন - ফাতাওয়াঃ কিতাবুল জিহাদ

দ্বিতীয় অবস্থাঃ তাদের মাঝে বাধ্য কোন ব্যক্তি রয়েছে - এ বিষয়টি আমাদের জানা থাকা কিন্তু তাদের মাঝে পার্থক্য করতে আমরা সক্ষম নইঃ তখন তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা জায়েয। কারণ তাদের মাঝে পার্থক্য করা একটি অসামর্থ্য বিষয়। আর কেবলমাত্র সক্ষম কাজের ব্যাপারে আমরা নির্দেশিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ الله বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ঐ সেনাদলকে ধ্বংস করেন যারা তার সম্মান-মর্যাদা নষ্ট করে, তিনি তাদের মাঝে পার্থক্য করার ব্যাপারে ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যে বাধ্য এবং যে বাধ্য নয় উভয়কে ধ্বংস করেন। এর সাথে সাথে তিনি তাদেরকে তাদের নিয়তের উপর পুনরুত্থিত করবেন। তাহলে কিভাবে মু'মিন মুজাহিদদের উপর ওয়াজিব হয় যে, তারা বাধ্য এবং যে বাধ্য নয় তাদের মাঝে পার্থক্য করবে - অথচ তারা এটা জানে না। বরং যদি কোন দাবিকারী দাবি করে যে, সে বাধ্য হয়ে বের হয়েছে, তার দাবির কারণে এটা তার উপকার করবে না। যেমন বর্ণিত আছে, "আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব নাবী ﷺ কে বললেন, যখন মুসলিমরা বদরের দিন তাকে বন্দি করে - হে আল্লাহর রাসুল! নিশ্চয়ই আমি বাধ্য ছিলাম। ফলে নাবী ﷺ বললেন, আপনার বাহ্যিক অবস্থা আমাদের নিকট। আর আপনার গোপন অভিপ্রায় আল্লাহর নিকট।" এমনকি যদি তাদের মধ্যে কতিপয় সৎ লোক থাকে যারা মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠতর এবং এই ব্যক্তিদের হত্যা করা ব্যতীত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব না হয় তাহলে এই ব্যক্তিদেরকেও হত্যা করা হবে। কেননা ইমামগণ এব্যাপারে একমত, কাফিররা যদি কতিপয় মুসলিমদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং মুসলিমদের ব্যাপারে আশঙ্কা করা হয় যদি তারা যুদ্ধ না করে তখন তাদেরকে আমাদের আক্রমণ করা জায়েয এবং আমরা উদ্দেশ্য করব কাফিরদের। আর যদি মুসলিমদের ব্যাপারে আমরা আশঙ্কা না করি তাহলে আলেমদের দুই বক্তব্যের একটিতে ঐ মুসলিমদেরকেও লক্ষ্য করা জায়েয। আর যে ব্যক্তি জিহাদের কারণে মৃত্যুবরণ করবে যার আদেশ আল্লাহ এবং তার রাসুল

করেছেন সে গোপন অবস্থায় মাজলুম শহিদ এবং তাকে তার নিয়তের উপর পুনরুত্থিত করা হবে।”

ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ধরনঃ

যুদ্ধরত আসলী কাফিরদের বিরুদ্ধে যে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ করা হয় ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র বিরুদ্ধে সেই একই বৈশিষ্ট্যে যুদ্ধ করা হবে। তাই তাদের বন্দিদের হত্যা করা হবে, তাদের পিছনে ধাওয়া করা হবে, তাদের আহতদের মেরে ফেলা হবে এবং তাদের সম্পদ গণিমত হিসেবে নেওয়া হবে। তবে যদি তাদের কেউ তাওবা করার পূর্বে তাকে পাকড়াও করা হয় অতঃপর সে তাওবা করে তাহলে তার তাওবার বিষয়টি তার মাঝে এবং আল্লাহর মাঝে থাকবে। আর দুনিয়াতে তার হুকুম হচ্ছে হত্যা করা - আসলী কাফিরের ক্ষেত্রে বিষয়টি এর বিপরীত।

আর মুরতাদ বন্দি নারীর মাস’আলায় আহলুল ইলমগণের মাঝে শক্তিশালী ইখতিলাফ রয়েছে - যা আসলী কাফির বন্দি নারীর হুকুমের মত নয়।

পরিচ্ছেদঃ

বাগী (বিদ্রোহী) দল

বিদ্রোহী দলের পরিচয়ঃ

ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত শক্তিশালী একটি দল যারা তাওয়ীল তথা ব্যাখ্যার অজুহাতে এমন মুসলিম ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যার ইমামত (নেতৃত্ব) প্রমাণিত। তারা তাকে অপসারণ করতে চায় অথবা তার আনুগত্য করতে সম্মত হয় না। এদেরকে “আহলুল বাগী তথা বিদ্রোহী গোষ্ঠী” বলা হয়। আর ইমামের দলকে “আহলুল আদল তথা ন্যায়পরায়ণ গোষ্ঠী” বলা হয়।

তাওয়ীল হলঃ যেমন তারা তার মধ্যে এমন বিষয় দেখতে পায় যা তাদের ধারণামতে জুলুম - তাদের ধারণা সঠিক হোক অথবা ভুল হোক তা সমান। আমরা প্রারম্ভিকে ইমামগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম হওয়ার বিষয়ে আলোচনা পেশ করেছি - যদিও তারা অত্যাচার করে।

বাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুমঃ

বাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শারয়ীসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সারকথা হচ্ছে সুরা হুজুরাতের আয়াতঃ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“আর মুমিনদের দু’দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও; অতঃপর তাদের একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে,

যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষন না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি তারা ফিরে আসে, তবে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে আপোষ মীমাংসা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকদেরকে ভালবাসেন।”[73]

এর কারণ হল, আল্লাহ جَلَّ شَأْنُهُ বলেছেন, “যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষন না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।” বাগী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى এর পক্ষ থেকে এটা একটি আদেশ - যা ওয়াজিব হওয়ার দাবি করে। আর এখানে যুদ্ধ করা ফরযে কিফায়া। যখন কিছু সংখ্যক লোক এটা সম্পাদন করবে তখন অন্যদের থেকে এটা বাতিল হয়ে যাবে। এটা একারণে যে, যদি বাগীদের ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই তারা যমিনে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করবে এবং মানুষের দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়াদি নষ্ট করবে। তাই যমিনে বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ এবং তাদের অনিষ্টতা বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব।

তবে এটা জানা উচিৎ যে, আল্লাহ تَبَارَكَ وَتَعَالَى যুদ্ধের আদেশের পূর্বে মীমাংসার আদেশ প্রথমে এনেছেন। তিনি সুবহানাহু বলেন, “তবে তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও।” যদি তারা মীমাংসা প্রত্যাখ্যান করে এবং বাগী দল বিকৃত চিন্তা ও দ্বীনের ব্যাপারে যে বিশ্বাস পোষণ করে তা থেকে ফিরে না আসে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে।

বাগীদের পলায়নকারী ও আহত ব্যক্তির হুকুমঃ

যখন বাগী ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিত্যাগ করবে হয়তো সে আঘাত পেয়ে আহত হওয়ার কারণে অথবা পরাজয় জানতে পেরে অথবা তার নিকট সত্য স্পষ্ট হওয়ার নিমিত্তে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে আনুগত্যে ফিরে আসার কারণে তখন অধিকাংশ ফক্বীহগণের মতে তাদের আহতকে মেরে ফেলা এবং

---

[73] সুরা হুজুরাতঃ ৯

তাদের পলায়নকারীদের ধাওয়া করা হারাম। এটা হাম্বলীগণের, শাফী এবং আবু হানিফার মত - এই শর্তে যে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা কোন দলের নিকট পরাজিত হবে না। যদি তারা কোন দলের নিকট পরাজিত হয় তখন হানাফিগণের মতে তাদের পলায়নকারীদের হত্যা করা এবং আহতকে মেরে ফেলা জায়েয।[74]

বাগীদের বন্দির হুকুমঃ

অধিকাংশ আলেমগণের মতে বাগীদের বন্দিকে হত্যা করা হারাম - বাগীদের জন্য এমন দল থাকুক - যার সাথে জোঁট বাধবে - অথবা না থাকুক তা সমান। এর কারণ হল বাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে প্রতিহত করা হত্যা করা নয়। আর বন্দির অনিষ্ট তার বন্দিত্বের মাধ্যমে তাড়িত হয় এবং মাক্বসাদও হাসিল হয়। এজন্য ফিতনা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হবে, কারাগারে তাকে সম্মান করা হবে এবং তাকে সত্যের দিকে আহ্বান করা হবে - যেন আল্লাহ তার অন্তরকে আলোকিত করে দেন। যখন ফিতনা দূর হয়ে যাবে তখন তার সাথে থাকা সম্পদসহ তাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

বাগীদের যে সম্পদ নষ্ট করা হয় অথবা যুদ্ধের ময়দানে তাদের যে রক্ত ঝরানো হয় এর হুকুমঃ

আহলুল ইলমগণের মাঝে এব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, বাগীদের থেকে শুরুকরে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের যে সম্পদ ও রক্ত ঝরে এর সবগুলোই বৃথা এবং যুদ্ধের ময়দানে তারা যা নিঃশেষ করে সেব্যাপারে তাদের জন্য কোন দায় নেই। তবে যুদ্ধের পরে তাদের সম্পদ দখল করা জায়েয নেই; কারণ তারা সর্বদাই মুসলিম।

[74] দেখুন - আল-বাদাঈঃ ৭/২০৮, আল-মাবসুত্বঃ ১০/১২৬ এবং আল-মুগনীঃ ৮/১৪৪

বাগীদের সম্পদ কি গণিমাহ হিসেবে নেওয়া হবে এবং তাদের সন্তান-সন্ততীদের দাস বানানো হবে?

আহলুল ইলমগণ এটা জায়েয না হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন; কারণ তারা সুরক্ষিত মুসলিম। বাগীদের প্রতিহত করার এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজনে যে রক্ত ও সম্পদ ঝরে তার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হারাম হওয়ার মূলনীতির উপরই এটা স্থায়ী।[75]

ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে এমন বস্তুর মাধ্যমে বাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার হুকুমঃ

ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে এমন বস্তুর মাধ্যমে বাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না - যেমন আগুন, মিনজানিক, পানি দিয়ে প্লাবিত করণ এবং আধুনিক যুগে এর সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ হয় - যেমন গাড়ি বিস্ফোরণ ও অন্যান্য বিষয়। তবে যদি জরুরত এ দিকে আহ্বান করে। যেমন এটা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব না।[76]

দুই দিকের নিহতদের হুকুমঃ

"ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের" নিহতরা শহিদ যারা তাদের নিজেদেরকে এমন এক যুদ্ধে উৎসর্গ করেছে যেব্যাপারে আল্লাহ আদেশ করেছেনঃ "যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর।"[77] তাদের সাথে তাই করা হবে অন্যান্য শহিদদের সাথে যা করা হয়। তাই তাদেরকে গোসল দেওয়া হবে না এবং তাদের কাপড় খোলা হবে না। বরং এই কাপড়ে তাদেরকে দাফন করা হবে এবং তাদের জানাযার সালাত পড়া হবে না; কারণ তারা শহিদ। আর "বাগীদের" নিহতরা ফিতনার নিহত যারা মুসলিম। তারা শহিদ নয়।

[75] আল-মুগনীঃ ১২/২৫৪

[76] আল-মুগনীঃ ১২/২৪৭

[77] সুরা হুজুরাতঃ ৯

তাদেরকে গোসল দেওয়া হবে, কাফন দেওয়া হবে এবং তাদের জানাযার সালাত পড়া হবে।

পরিচ্ছেদঃ

যুদ্ধরত দল (ডাকাত দল)

পরিচয়ঃ

শক্তিসম্পন্ন একটি দল যারা সম্পদ লুণ্ঠন অথবা রক্তপাত অথবা সম্মান নষ্ট করার জন্য দারুল ইসলামে লড়াই করতে বের হয়।[78]

আল-হিরাবাহ তথা ডাকাতির শর্তসমূহঃ

আল-হিরাবাহ বিশেষণ যে ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হয় তার ক্ষেত্রে ফক্বীহগণের উল্লেখিত শর্তসমূহের সারসংক্ষেপ হল ছয়টি। তবে এর কিছু শর্ত ঐক্যমত সমর্থিত নয়। সেগুলো হলঃ

১. মুকাল্লাফ হওয়াঃ অর্থাৎ সে বালেগ ও আক্বেল তথা বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়া। এই শর্তের ব্যাপারে ফক্বীহগণের মাঝে কোন মতভেদ নেই।

২. শারীয়াহ'র বিধি-বিধান পালন করাঃ অর্থাৎ সে শারয়ী বিধি-বিধান পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। সে মুসলিম হোক অথবা যিম্মি হোক তা সমান। যার সাথে চুক্তি করা হয় এবং যে আশ্রয় চায় সে এর অন্তর্ভুক্ত হবে না; কারণ যখন সে এটা করবে তখন সে তার চুক্তি ভঙ্গ করবে।

৩. অস্ত্র বহন করাঃ হানাফী এবং হাম্বলী ফক্বীহগণ শর্তারোপ করেছেন যে, লড়াইকারীর সাথে অস্ত্র থাকা - যদিও একটি পাথর অথবা একটি লাঠি হয়। নচেৎ সে লড়াইকারী হবে না।[79] তবে মালিকী এবং শাফী ফক্বীহগণ অস্ত্র বহন করা শর্তারোপ করেন নি। বরং তাদের নিকট

[78] দেখুন - বাদাঈউস-সানাঈঃ ৭/৯০, নিহায়াতুল মুহতাজঃ ৮/২, আল-মুগনীঃ ৮/২৮৭ এবং মাহাল্লীঃ ১১/৩০৮

[79] দেখুন - হাশিয়াতু ইবনে আবিদীনঃ ৩/২১৩ এবং আল-মুগনীঃ ৮/২৮৮

পরাভূত করা এবং দমন করা যথেষ্ট। যদিও ঘুষি মারা ও হাত দিয়ে প্রহার করার মাধ্যমে হয়।[80]

৪. বসতবাড়ি থেকে দূরে হওয়াঃ অর্থাৎ ভবন-কাঠামো থেকে অথবা এরকম স্থাপনা থেকে - দূরে মরুভূমি বা নির্জন প্রান্তরে তাদের অবস্থান করা। এটা হানাফী ও হাম্বলীগণের মত। কিন্তু বিশুদ্ধ হচ্ছে অধিকাংশ আলেমদের মত - এটা শর্তারোপ না করা। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ বলেন, "এটাই সঠিক যে, বসতবাড়িতে তাদের অবস্থান করা অধিক শাস্তিযোগ্য মরুভূমিতে তাদের অবস্থান করার চেয়ে। কারণ বসতবাড়ি নিরাপত্তা ও প্রশান্তিতে থাকার কেন্দ্র এবং মানুষ একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। অতঃপর সেখানে তাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করাটা তীব্র যুদ্ধ ও লড়াইয়ের দাবি করে।"

৫. প্রকাশ্যে করাঃ ভোগ সামগ্রী থেকে সম্পদ এবং অন্যান্য বস্তু দখল করা প্রকাশ্য হবে গোপনীয় নয়; কারণ গোপনে দখল করাকে চুরি হিসেবে গণ্য করা হয়।

৬. পুরুষ হওয়াঃ কেবল হানাফীগণ এই শর্তে শর্তারোপ করেছেন। আর জুমহুর আলেমগণ মনে করেন, মহিলা যখন ডাকাতির অপরাধ করবে তখন তার হুকুম পুরুষ ডাকাত অপরাধকারীদের হুকুমের মত হবে।[81]

ডাকাতদের শাস্তিঃ

ফক্বীহগণের মাঝে কোন ইখতিলাফ নেই যে, ডাকাতের শাস্তি হচ্ছে আল্লাহর হদসমূহের মধ্য থেকে এক প্রকার হদ যেখানে বিয়োজন এবং ক্ষমা গ্রহণ করা হবে না। যতক্ষণ না তাদের পাকড়াও করার পূর্বে তারা তাওবা করে। এব্যাপারে দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

---

[80] দেখুন - আল-মুদাওয়ানাহঃ ৬/৩০৩ এবং রওদাতত ত্বলিবীনঃ ১০/১৫৬

[81] দেখুন - আল-মুগনীঃ ৮/২৯৮

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

“যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় অন্যায় কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি কেবল এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। তবে তারা ছাড়া, যারা তোমাদের আয়ত্তে আসার পূর্বেই তাওবা করবে। সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[82]

তবে ফক্বীহগণ এই সকল শাস্তির ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেনঃ এগুলো কি ইচ্ছা স্বাধীনের উপর হবে নাকি শ্রেণী বিন্যাসের উপর হবে? অর্থাৎ ইমাম কি এই চারটির ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন নাকি প্রত্যেকটি তার অপরাধ অনুসারে হবে?[83]

জুমহুর আলেমগণ মত দিয়েছেন যে, আয়াতে "أو" তথা “অথবা” শব্দটি বিধানের বিন্যাসকরণ এবং অপরাধের ক্ষেত্রে সে যার উপযুক্ত সে মোতাবেক বিধান ভাগকরণের জন্য বর্ণিত হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি হত্যা করবে এবং সম্পদ ছিনিয়ে নিবে তাকে হত্যা করা হবে এবং শূলে চড়ানো হবে। আর যে ব্যক্তি সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়াতে সীমাবদ্ধ থাকবে তার ডান হাত এবং বাম

---

[82] সুরা মায়িদাহঃ ৩৩-৩৪

[83] দেখুন - আল-বাদাঈঃ ৭/৯৩ এবং আল-মুগনীঃ ৮/২৮৯

পা কর্তন করা হবে। যে ব্যক্তি রাস্তায় ভীতসন্ত্রস্ত করবে হত্যা করবে না এবং সম্পদ ছিনিয়ে নিবে না তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং এরকম বিষয়াদি।

বাগী দলের মাঝে এবং ডাকাত দলের মাঝে পার্থক্যঃ

১. ডাকাত কোন তাওয়ীল ছাড়া পাপ ও অন্যায় করার জন্য বের হয়। আর বাগী তাওয়ীলের অজুহাতে বের হয়।

২. ডাকাত দুনিয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়। আর বাগী দ্বীনের উদ্দেশ্যে বের হয়।

৩. ডাকাত প্রজাসাধারণের বিরুদ্ধে বের হয়। আর বাগী ইমামের বিরুদ্ধে বের হয়।

পরিচ্ছেদঃ

খাওয়ারিজ

তাদের পরিচয়ঃ হাফিয ইবনে হাজার رَحِمَهُ اللهُ তাদের পরিচয় এবং তাদের নামকরণের ব্যাপারে বলেন, "খারিজিরা বিদ্রোহী সমষ্টি অর্থাৎ দল। তারা নতুন উদ্ভাবিত একটি সম্প্রদায়। দ্বীন থেকে তাদের বের হয়ে যাওয়ার কারণে এবং মুসলিমদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহের কারণে এ নামে তাদেরকে অভিহিত করা হয়।"[84]

খারিজিদের কতিপয় উছূল বা মূলনীতিঃ

১. কবিরাহ গুনাহ সম্পাদনকারীকে তাকফির করা।

২. কবিরাহ গুনাহ সম্পাদনকারীকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী করা।

৩. কবিরাহ গুনাহ সম্পাদনকারীর রক্ত ও সম্পদ হালাল মনে করা।

৪. কতিপয় সাহাবীগণকে তাকফির করা।

৫. আম তথা ব্যাপকভাবে তাকফির করা।

৬. আল্লাহর কিতাব কুরআনে যা প্রমাণিত শুধুমাত্র তা গ্রহণ করা এবং এককভাবে সুন্নাহ'তে যা রয়েছে তা প্রত্যাখ্যান করা। তাই তারা যেমন বিবাহিত যিনাকারীকে রজম (পথার মেরে হত্যা) করে না। কারাণ রজম করা শুধুমাত্র সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।[85]

---

[84] ফাতহুল বারীঃ ১২/২৯৬

[85] আল-মিলাল ওয়ানহ-নিহাল লিশ- শাহরস্তানীঃ ১০৫, ১০৭ এবং আল-ফাতাওয়াঃ ৩/২৭৯, ৭/৪৮১, ১৯/৭২

সুন্নাহ'তে বর্ণিত খারিজিদের কতিপয় সিফাতঃ

১. তারা আহলুল ইসলাম তথা মুসলিমদের হত্যা করে এবং মূর্তিপূজক তথা মুশরিকদের ছেড়ে দেয়।

২. মাথার চুল মুণ্ডন করা।

৩. ইমামতের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য - কুরাইশী হওয়া শর্ত নয়।

৪. দ্বীনের মূলনীতি ও এর শাখাগত বিষয়ে তাদের অজ্ঞ হওয়া।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

দার তথা ভূমির বিধি-বিধান

প্রারম্ভিকাঃ

প্রথম অধ্যায়ে ইসলামে দাওলাহ সম্পর্কে, দাওলাহ'র ইমাম নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে এবং তদসংশ্লিষ্ট কতিপয় মাস'আলা সম্পর্কে আলোচনা বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে দাওলাহ'র অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে - যেমন ইমামের সাথে প্রজাসাধারণের সম্পর্ক, ইমামের আনুগত্য করা ওয়াজিব, এব্যাপারে নীতিমালা এবং পারস্পারিক অধিকারসমূহ। এমনিভাবে ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের বাস্তবতা এবং তাদের সাথে আচরণের পদ্ধতি।

অভ্যন্তরীণ শারয়ী রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে মুজাহিদদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো জানা উচিৎ তাতেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রয়েছে। এব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা স্বভাবতই শারয়ী রাষ্ট্রনীতির বিস্তৃত কিতাবগুলোতে রয়েছে।

ইনশা'আল্লাহ আমরা এই অধ্যায়ে দার তথা ভূমির বিশেষণ লাগানোর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে আলোচনা করব। যে ভূমি মুসলিমরা শাসন করে যা অন্যান্য ভূমির সাথে সংযুক্ত এবং এই বিশেষণ লাগানোর উপর প্রতিষ্ঠিত কতিপয় মাস'আলা সম্পর্কে আলোচনা করব।

পরিচ্ছেদঃ

দার বা ভূমির পরিচয় এবং পৃথিবী দুই দারে বিভক্ত

দারের শাব্দিক অর্থঃ

শাব্দিকভাবে দারকে স্থানের উপর প্রয়োগ করা হয় যা আঙ্গিনা[৮৬] ও ভবনকে অন্তর্ভুক্ত করে। দারকে লোকালয়ের উপরেও প্রয়োগ করা হয়।

ভাষাবিদগণ বলেন, "দারঃ এমন আবাসস্থল যার চতুর্পাশে অবকাঠামো একত্রিত করে। তিনি তা'আলা বলেন,

﴿فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا﴾

"অতঃপর তারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। আর এটা ছিল এমন প্রতিশ্রুতি যা কার্যকর হওয়ারই ছিল।"[87]

তিনি তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি! যারা তাদের গৃহসমূহ থেকে বের হয়েছে।"[88]

অতএব দার দ্বারা উদ্দেশ্য হলঃ শহর অথবা দেশ অথবা দাওলাহ অথবা এমনকি গ্রাম। কারণ মানব সামাজ পৃথিবীর যে স্থানেই বসবাস করে তারা

---

[৮৬] আঙ্গিনাঃ অঞ্চলসমূহের মাঝে এমন প্রত্যেক প্রশস্ত স্থান যার মধ্যে কোন ভবন নেই

[87] সুরা ইসরাঃ ৫

[88] সুরা বাকারাহঃ ২৪৩

একটি নিযাম (পদ্ধতি) পরিচালনা করে যার নিকট সেই সমাজ তাদের সকল বিষয়াদির ক্ষেত্রে বিচার চায় - হোক সেটা শারয়ী নিযাম অথবা গঠনকৃত নিযাম তা সমান।

আমাদের এটা বলা সম্ভব যে, দারঃ যা ভূখণ্ড এবং এর শাসনাধীন অঞ্চলসমূহ শামিল করে।

পরিভাষায় দারের অর্থঃ

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলেমগণ পৃথিবী দুই দারে বিভক্ত করণের ব্যাপারে ইখতিলাফ করেন নি - এ দু'টির তৃতীয়টি নেই। দারুল ইসলাম (ইসলামের ভূমি) এবং দারুল কুফরে (কুফরের ভূমি) এই ভাগকরণ আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসুলের সুন্নাহ'র উপর ভিত্তিকরে মৌলিক ভাগকরণ।

আল্লাহ তা'আলার কিতাব থেকে দলিলঃ

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ﴾

"আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান আনয়ন করেছে, যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তারা তাদের ভালবাসে।"[89]

ইমাম ইবনে কাসির رَحِمَهُ الله বলেন, "অর্থাৎ তারা মুহাজিরদের পূর্বে হিজরতের ভূমিতে বাস করেছেন এবং তাদের অনেকের পূর্বে তারা ঈমান এনেছেন।"

তিনি তা'আলা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي

[89] সুরা হাশরঃ ৯

الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ

وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

"নিশ্চয়ই যারা নিজদের প্রতি জুলুমকারী, ফিরিস্তাগণ তাদের জান কবজ করার সময় বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম। ফিরিস্তাগণ বলে, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তথায় হিজরত করতে? সুতরাং এদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।"[90] কুরআন এবং সুন্নাহ'তে যখন হিজরত প্রয়োগ হয় তখন এর অর্থ বুঝায় দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত হওয়া।

সুন্নাহ থেকে দলিল হলঃ দার তথা ভূমি ভাগকরণের ব্যাপারে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়ছে, এর মধ্যে রয়েছে যা মুসলিম বুরাইদাহ ইবনে হুছাইব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন, "অতঃপর তুমি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে, যদি তারা তোমার ডাকে সাড়া দেয় তাহলে তাদেরকে গ্রহণ করবে এবং তাদের থেকে বিরত থাকবে। অতঃপর তাদেরকে তাদের দার থেকে মুহাজিরদের দারে স্থানান্তরিত হওয়ার দিকে আহ্বান করবে এবং তাদেরকে অবহিত করবে যে, যদি তারা তা করে তাহলে তাদের জন্য তাই থাকবে যা মুহাজিরদের জন্য রয়েছে এবং তাদের উপরেও তা থাকবে যা মুহাজিরদের উপর রয়েছে।"

নাসাঈ رَحِمَهُ اللهُ সহিহ সনদে জাবির ইবনে যায়েদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বলেছেন, "আল্লাহর রাসুল ﷺ এবং আবু বকর, ওমর - তারা মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কেননা তারা মুশরিকদের ত্যাগ করেছিলেন। আর আনসারগণও মুহাজির ছিলেন, কেননা মদীনা দারুশ-শিরক বা শিরকের ভূমি ছিল। অতঃপর তারা

[90] সুরা নিসাঃ ৯৭

আল্লাহর রাসুল ﷺ এর নিকট লাইলাতুল আক্বাবাতে এসেছিলেন।”

দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফরের পরিচয়ঃ

দারুল ইসলামঃ এমন প্রত্যেক দেশ বা ভূমি যেখানে ইসলামের বিধানসমূহ সমুন্নত এবং সেখানে বিজয়, ক্ষমতা ও কথা মুসলিমদের জন্য হয়। যদিও এই দারের অধিকাংশ বসবাসকারী কাফির হয়।

দারুল কুফরঃ এমন প্রত্যেক দেশ বা ভূমি যেখানে কুফরের বিধানসমূহ সমুন্নত এবং সেখানে বিজয়, ক্ষমতা ও কথা কাফিরদের জন্য হয়। যদিও এই দারের অধিকাংশ বসবাসকারী মুসলিম হয়।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম رَحِمَهُ الله বলেন, “দারুল ইসলাম হল যেখানে মুসলিমরা অবস্থান করে এবং ইসলামের বিধানসমূহ চলমান থাকে। আর যেখানে ইসলামের বিধানসমূহ বলবৎ থাকে না সেটা দারুল ইসলাম নয়। যদিও সেটা অতি নিকটবর্তী হয়। কেননা ত্বাইফ মক্কার অতি নিকটে ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তা (ত্বাইফ) দারুল ইসলামে পরিণত হয়নি। এমনিভাবে সীমান্তবর্তী এলাকাও।”

ইমাম ইবনে মুফলিহ رَحِمَهُ الله বলেন, “দারুল ইসলাম ও দারুল হারব প্রতিষ্ঠিত করণের ব্যাপারে পরিচ্ছেদঃ এমন প্রত্যেক দার যেখানে মুসলিমদের বিধানসমূহ বিজয়ী হয় সেটাই দারুল ইসলাম। আর যদি সেখানে কাফিরদের বিধানসমূহ বিজয়ী হয় তাহলে সেটাই দারুল কুফর। এই দুইটি ব্যতীত আর কোন দার বা ভূমি নেই।”

দারের উপর ইসলাম অথবা কুফরের হুকুম দেওয়ার কারণঃ

আলেমগণের বক্তব্যের বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট যে, দারের উপর হুকুম দেওয়ার জন্য তারা দুইটি কারণ উল্লেখ করেছেনঃ

প্রথমঃ শক্তি এবং বিজয়।

দ্বিতীয়ঃ তাতে বাস্তবায়িত বিধানের প্রকার।

ইবনে হাযম رَحِمَهُ الله বলেন, "আল্লাহর রাসুল ﷺ এর কথাঃ << আমি এমন প্রত্যেক মুসলিম থেকে মুক্ত যে মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে >> আমরা যা বলেছি তা স্পষ্ট করে যে, তিনি ﷺ এর মাধ্যমে দারুল হারব বুঝিয়েছেন। কেননা তিনি ﷺ তার কর্মচারীদের খায়বারে নিযুক্ত করেছিলেন। অথচ তারা ইহুদী ছিল। আর যখন আহলুয-যিম্মা (যিম্মার অধিন) তাদের সাথে মেলামেশা করে তখন তাদের মধ্যে বসবাসকারী - তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অথবা তাদের মাঝে বসবাসের জন্য - কাফির ও মুছি' (যে মন্দ কাজ করে এমন ব্যক্তি) হবে না। বরং সে একজন ভালো মুসলিম। তাদের দার হল দারুল ইসলাম, শিরকের দার বা ভূমি নয়। কেননা দারকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় এর উপর বিজয়ী, এর শাসনকারী ও এর শাসনকর্তার ভিত্তিতে।"

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনে হাসান رَحِمَهُمَا الله থেকে বর্ণিত, "যখন তারা সেখানে শিরকের বিধানসমূহ প্রকাশ করবে তখন তাদের দার হবে দারুল হারব। কেননা আমাদের নিকট ও তাদের নিকট ভূমি সম্বন্ধযুক্ত করা হয় শক্তি ও বিজয়ের ভিত্তিতে। সুতরাং প্রত্যেক এমন ভূমি যেখানে শিরকের বিধান জয়ী হয় অতঃপর ঐ স্থানে ক্ষমতা মুশরিকদের জন্য হয় তখন সেটা দারুল হারব (যুদ্ধ ভূমি) হয়। আর প্রত্যেক এমন স্থান যেখানে ইসলামের বিধান জয়ী হয় অতঃপর ক্ষমতা মুসলিমদের জন্য হয়।"[91]

শাওকানী رَحِمَهُ الله বলেন, "কালিমা বা কথা প্রকাশের ভিত্তিতে দার গণ্য করা হয়। তাই যদি দারে আদেশ ও নিষেধ করার অধিকার মুসলিমদের হয়, এইভাবে যে, সেখানে কাফিরদের কোন ব্যক্তি ততটুকুই কুফরি প্রকাশ করতে পারে যতটুকুর অনুমতি মুসলিমদের পক্ষ থেকে তাকে দেওয়া আছে। আর

[91] আল-মাবসুতঃ ১০/১১৪

এটাই হল দারুল ইসলাম। সেখানে কুফরের স্বভাব প্রকাশ করাতে ক্ষতি নেই। কেননা কাফিরদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। যেমনটি ইসলামী শহরগুলোতে ইহুদী, খ্রিস্টান ও চুক্তিবদ্ধ বসবাসকারী আহলুয-যিম্মাদের ব্যাপারে দেখা যায়। আর যখন বিষয়টি এর বিপরীত হবে তখন দারও বিপরীত হবে।”

দারুল কুফরের প্রকারঃ

দারুল কুফরে কুফরি সংঘটিত হওয়ার দিক থেকে তা দুই প্রকার। কুফরটি হয়তো প্রচিনতম হবে অথবা বহিরাগত হবেঃ

১. আসলি দারুল কুফরঃ অর্থাৎ সেটা কখনোই কোন সময়ের জন্য দারুল ইসলাম ছিল না।

২. বহিরাগত দারুল কুফরঃ অর্থাৎ সেটা কোন একসময় দারুল ইসলাম ছিল। অতঃপর কাফিররা তা দখল করেছে অথবা এর শাসকরা মুরতাদ হয়েছে।

দারের বৈশিষ্ট্য কোন অবিচ্ছেদ্য চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য নয়। বরং তা অস্থায়ী পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্য এই অর্থে যে, দার এক বৈশিষ্ট্য থেকে অন্য বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন হয়। ফলে দার কোন একসময় দারুল কুফর থাকে অতঃপর দারুল ইসলামে পরিণত হয় এবং তা কখনো দারুল ইসলাম থাকে অতঃপর দারুল কুফরে পরিণত হয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رَحِمَهُ اللهُ বলেন, “পৃথিবী হয়তো দারুল কুফর হবে অথবা দারুল ইসলাম হবে অথবা দারুল ঈমান হবে অথবা দারুস-সিলম অথবা দারুল হারব অথবা দারুত-ত্বআহ অথবা মা’ছিয়্যাহ অথবা দারুল মু’মিনীন অথবা ফাসিক্বীন হবে। এগুলো অস্থায়ী বৈশিষ্ট্য অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য নয়। তা এক বৈশিষ্ট্য থেকে অন্য বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তিত হয়। যেমন - কোন লোক তার নফসকে নিয়ে কুফর থেকে ঈমান ও ইলমের দিকে

স্থানান্তরিত হয়। এমনিভাবে বিপরীতটিও হয়।”[92]

[92] আল-ফাতাওয়াঃ ২৭/৪৫

পরিচ্ছেদঃ

গুরুত্বপূর্ণ মাসা’ইল এবং সতর্কীকরণ

প্রথম মাস’আলাঃ

দারের উপর ভিত্তি করে হুকুম দেওয়া যাবে না, এইভাবে যে, মুসলিমদের মধ্য থেকে যে দারুল কুফরে - আসলি হোক অথবা বহিরাগত হোক - অবস্থান করবে তাকে কাফির হিসেবে হুকুম দেওয়া। বরং এটা সীমালঙ্ঘনকারীদের বক্তব্য এবং খারিজিদের একটি আচরণ।

আবুল হাসান আশ’আরী رَحِمَهُاللهُ খারিজিদের একদল থেকে এই কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, “আযারিক্ব সম্প্রদায় মনে করে, যে ব্যক্তি দারুল কুফরে অবস্থান করবে সে কাফির। তার একমাত্র পথ হল বের হওয়া।”[93]

বাইহাছিয়্যাহ এবং আওফিয়্যাহ খারিজি সম্প্রদায় থেকে তিনি আরো বর্ণনা করেছেন, “তারা বলে, যখন ইমাম (নেতা) কাফির হয় তখন তাদের উপস্থিত অনুপস্থিত সকল জনগণ কাফির হয়ে যায়।”[94]

এটা একারণে যে, একজন মুসলিম আকাশের নিচে পৃথিবীর উপরে ইসলামের মধ্যেই থাকে যতক্ষণ না সে ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের কোন একটিতে লিপ্ত হয়। নিশ্চিতভাবে যা প্রমাণিত হয় তা সন্দেহ দ্বারা বিলুপ্ত হয় না।

ইমাম শাওকানী رَحِمَهُاللهُ বলেন, “আপনি জেনে রাখুন, দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর উল্লেখ করে পর্যালোচনা করা খুবি কম ফায়দাজনক - অর্থাৎ এতে বসবাসকারীদের উপর হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে - যে কারণে আমরা

---

93 মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীনঃ ১/৮৮

94 মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীনঃ ১/১৯২, ১৯৪

আপনার জন্য দারুল হারবের ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করেছি, তা হল হারবী (যুদ্ধরত) কাফিরের রক্ত ও সম্পদ সর্বাবস্থায় বৈধ যতক্ষণ না মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। আর মুসলিমের রক্ত ও সম্পদ দারুল হারব ও অন্যান্য স্থানে ইসলামের বন্ধনের কারণে নিরাপদ।”

শাইখ সুলাইমান ইবনে সাহমান رَحِمَهُ اللهُ বলেন,

“যখন কোন পরাভূতকারী কাফির বিজয়ী হয়

দারুল ইসলামের উপর, সেখানে আতঙ্ক নেমে আসে

সে তাতে প্রকাশ্যে কুফরের বিধি-বিধান জারী করে

কোন সুযোগ না রেখে তাতে সে কুফরের বিধি-বিধান প্রকাশ করে

সে তাতে মুহাম্মাদের শারীয়াহ’র বিধি-বিধানকে দূর্বল করে দেয়

সেখানে সে ইসলাম প্রকাশ করে না এবং সে অন্যের চরিত্র গ্রহণ করে

তখন প্রত্যেক মুহাক্কীক্ব আলেমের নিকট সেটা দারুল কুফর

যেমন ‘দিরায়া’ এর লেখক ‘নিহাল’ এর ব্যাপারে বলেছেন

আর সেখানে অবস্থানরত প্রত্যেকেই কাফির নয়

কারণ সেখানে অনেক ব্যক্তিই সৎ আমলের উপর রয়েছে।”

দ্বিতীয় মাস’আলাঃ

হিজরতের শাব্দিক পরিচয়ঃ

এক ভূমি থেকে অন্য ভূমির উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হওয়া এবং বের হওয়া।

ইমাম ইবনুল আছির رَحِمَهُ الله ‘আন-নিহায়া’তে বলেন, “মূলত হিজরত হচ্ছেঃ "الهجر" (বর্জন করা) শব্দ থেকে গৃহীত বিশেষ্য যা বন্ধনের বিপরীত। সে তা বর্জন করল। অতঃপর সে এক ভূখণ্ড থেকে অন্য ভূখণ্ডের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয়টির জন্য প্রথমটিকে ত্যাগ করার ভিত্তিতে জয়ী হয়েছে।”

হিজরতের শারয়ী পরিচয়ঃ আল্লাহর জন্য দারুল কুফর ত্যাগ করে দারুল ইসলামের উদ্দেশ্যে বের হওয়া। হিজরত দ্বারা সাধারণভাবে এটাও উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যে, অবাধ্যতার ভূমি ত্যাগ করে আনুগত্যের ভূমিতে যাওয়া এবং বিদআতের ভূমি ত্যাগ করে সুন্নাহ’র ভূমিতে যাওয়া।

হিজরতের হুকুমঃ ইবনুল ক্বাসিম رَحِمَهُ الله উছূলুছ-ছালাছাহ’র হাশিয়াতে বলেন, “এটা জানা বিষয় যে, কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা তা - অর্থাৎ হিজরত - প্রমাণিত। যে তা পরিত্যাগ করবে তার ব্যাপারে হুমকি দেওয়া হয়েছে। একাধিক আহলুল ইলমগণ এর উপর ইজমা বর্ণনা করেছেন যে, শিরকের ভূমি থেকে ইসলামের ভূমিতে হিজরত করা ওয়াজিব।”

প্রথম সতর্কীকরণঃ হুদুদ বাস্তবায়ন করা ইমামের এবং ইমামের পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি নিযুক্ত হয় তার দায়িত্বঃ

ফক্বীহগণ এব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, দারুল ইসলামে যিনি হদ বাস্তবায়ন করবেন তিনি হলেন ইমাম অথবা তার প্রতিনিধি। হোক তা রিদ্দাহ অথবা অবশিষ্ট হদ ও তা’যীর তথা শাস্তিসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হয় তা সমান; কেননা এ বিষয়টি ইজতিহাদ তথা গবেষণার মুখাপেক্ষী হয় এবং এব্যাপারে

জুলুমের আশঙ্কামুক্ত হওয়া যায় না। তাই ওয়াজিব হচ্ছে বিষয়টি ইমামের নিকট ন্যস্ত করা। কারণ নাবী ﷺ তার জীবদ্দশায় হুদুদ বাস্তবায়ন করতেন, এমনিভাবে তার পরে খলিফাগণও হুদুদ বাস্তবায়ন করতেন। আর সেব্যাপারে ইমামের স্থানে তার প্রতিনিধি স্থলাভিষিক্ত হতেন।[95] তাই যে ব্যক্তি ইমামের উপর স্বেচ্ছাচারিতা করে নিজে হদ বাস্তবায়ন করবে নিশ্চয়ই সে শাস্তির এবং আদব শেখার যোগ্য হবে।[96]

দ্বিতীয় সতর্কীকরণঃ দ্বীনের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং তাদের সেবা করাঃ

ইসলামী শারীয়াহ যে মহান উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করে এর মধ্যে রয়েছে মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করা, সকল প্রকার সৎকাজের প্রচেষ্টা করা, তাদের সাহায্য ও সেবা প্রদান করা, তাদের কষ্ট লাঘব করা, তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করা এবং তাদের থেকে ক্ষতি দূর করা। এই মূলনীতির উপরেই কুরআন এবং সুন্নাহ'র নছসমূহ প্রমাণ করে।

ইমাম ইবনু আব্দিল বার رَحِمَهُ اللهُ উল্লেখ করেছেন যে, ন্যায়পরায়ণতা, অনুগ্রহ এবং উত্তম শিষ্টাচারের জন্য সবচেয়ে সমন্বিত একটি আয়াত আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ এর এবাণীঃ

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার

---

[95] দেখুন - মুনতাহাল ইবাদাতঃ ৩/৩৩৬, মুহাযযাবঃ ২/২৭০, ফাতহুল ক্বাদীরঃ ৫/১১৩ এবংগ মানহুল জালীলঃ ৪/৫০০

[96] দেখুন - মুনতাহাল ইবাদাতঃ ৩/৩৩৭, আল-মুগনীঃ ৮/ ১১৮ এবং আল-বাদাঈঃ ৭/৮৮

আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।”[97]

বুখারি ও মুসলিম জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ رَضِيَاللهُعَنْهُمَا থেকে বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক ভালো কাজই সাদাক্বাহ।”[98]

আবু হুরায়রা رَضِيَاللهُعَنْهُ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেহ যখন সূর্য উঠে মানুষের (শরীরের) প্রত্যেক গ্রন্থির সাদাক্বাহ দেয়া অবশ্য কর্তব্য। দু’জন মানুষের মাঝে ইনসাফ করা হচ্ছে সাদাক্বাহ, কোন আরোহীকে তার বাহনের উপর আরোহন করতে বা তার উপর বোঝা উঠাতে সাহায্য করা হচ্ছে সাদাক্বাহ, ভাল কথা হচ্ছে সাদাক্বাহ, সালাতের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ হচ্ছে সাদাক্বাহ এবং কষ্টদায়ক জিনিস রাস্তা থেকে সরানো হচ্ছে সাদাক্বাহ।”

হাদিসে আবু যার رَضِيَاللهُعَنْهُ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তার কথাঃ “আমি বললাম, তাও যদি না পারি? তিনি বললেন, তাহলে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকবে। আর সেটা হবে তোমার পক্ষ থেকে কৃত সাদাক্বাহ।”[99] নাবী ﷺ যখন মদিনায় আগমন করেছিলেন তখন সর্বপ্রথম যে বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তা হল - তিনি বলেছেন, “হে লোক সকল! তোমরা সালামের প্রচার -প্রসার কর, খাদ্য খাওয়াও এবং লোকে যখন (রাতে) ঘুমিয়ে থাকে, তখন তোমরা সালাত পড় - তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[100]

---

[97] সুরা নাহলঃ ৯০

[98] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি

[99] মুত্তাফাক্বুন আলাইহি

[100] তিরমিযী এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন

উপসংহার

দাওলাতুল ইসলাম ব্যতীত সমসাময়িক প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বদেশীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা তথা সম্পর্ক করা এবং সম্পর্কচ্ছেদ করা সম্পন্ন করে এবং দেশের লোকদেরকেই নেতৃত্ব ও পরিচালনায় এগিয়ে দেয়। এমনকি ঐ সকল রাষ্ট্র মিথ্যা রটিয়ে এবং অপবাদ দিয়ে ইসলামের সাথে প্রতারণা করে। আর দাওলাতুল ইসলাম আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা ইসলামের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে - ইসলাম ব্যতীত অন্য কিছুর ভিত্তিতে নয়। দাওলাতুল ইসলাম মু'মিনকে নিকটবর্তী করে নেয় এবং সে আরবী হোক অথবা অনারবী হোক তার সাথে ওয়ালা করে। আর যে ব্যক্তি দাওলাতুল ইসলামের তত্ত্বাবধায়নে বসবাস করে সে নিজ চোখেই মানুষের অনেক প্রকার এবং তাদের ভাষার ভিন্নতা দেখবে। তাহলে বসে থাকা ব্যক্তিরা কিসের অপেক্ষা করছে এবং এরপরেও কেন তারা দাওলাতুল ইসলামে যোগ দেয় নি?

ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মানুষের মাঝে খুতবা দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা জাহিলী যুগের অন্ধ অহমিকা এবং পিতৃপুরুষদের নিয়ে গর্ব করার প্রথা ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। মানুষ হল দু'ধরনের। এক প্রকার হল সৎ, মুত্তাকী এবং আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান। আরেক প্রকার হল অসৎ, দুর্ভাগা এবং আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট। মানুষ হল আদমের সন্তান। আল্লাহ তা'আলা আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে,

আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী মুত্তাক্বী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"[101], [102]

সুতরাং প্রত্যেক অঞ্চলে ও দেশে অবস্থানরত হে ইসলামের সন্তানগণ! আপনারা চলে আসুন! আল্লাহর সাহায্যে অতি নিকটেই আমাদের পতাকা আপনাদের দেশে এগিয়ে যাবে এবং সম্প্রসারিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির পরে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।

[101] সুরা হুজুরাতঃ ১৩

[102] তিরমিযী বর্ণনা করেছেন

আর এরপর যারা কুফরি করবে তারাই ফাসিক্ব।”[103]

সম্মানিত মাওলার নিকট কামনা করি, তিনি যেন দাওলাতুল খিলাফাহ’র তামকীনে অংশগ্রহণ করার, এর পথ দেখানোর এবং এর সঠিক পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে আমাদেরকে অনুগ্রহ করেন। কেননা এ দাওলাতুল খিলাফাহ - আমরা যেমনটি মনে করি - আল্লাহর নিকট নির্দিষ্ট ফায়সালা এবং তার সুনিশ্চিত বাস্তব ওয়াদা। আর আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।

وآخِرِ دَعوانا أن الحَمد لله ربِّ العٰلمِين

وصلّي اللّٰهُ وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين

গবেষণা ও শিক্ষা অফিস

১৪৩৬ হিজরী

---

[103] সুরা নুরঃ ৫৫

المنهل

MAKTABATUL MANHAL

মাকতাবাতুল মানহাল

আমাদের অন্যান্য প্রকাশনা–





MAKTABATUL MANHAL
মাকতাবাতুল মানহাল